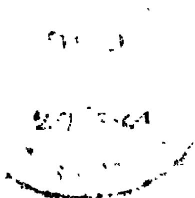
জলপ্রপাত

নরেন্দ্রনাথ মিত্র



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই ফাল্গুন,
১৮৮১ শকাব্দ

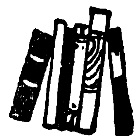
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১১০০ সংখ্যা
কার্তিক, ১৮৮৪ শকাব্দ

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬



উৎসর্গ

সাইদা খানম

সুচরিতাসু



এক

জাদুঘরের একাংশে প্রতি বছর অল ইণ্ডিআ আর্ট একজিবিশনের যে প্রদর্শনী হয় আমি তাতে একবার করে যাই। কোনবার শিল্পী-বন্ধু সঙ্গে থাকেন, কোনবার আমার মত অশিল্পী কাউকে নিয়েই ঘুরে আসি। মাস দেড়েক প্রদর্শনীটি থাকে। কোন বছর দু তিন দিন যাই, কোন বছর একদিন মাত্র। একদিনেই শ তিনেক ছবির ওপর দেড় ঘণ্টা কি দু ঘণ্টার মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চলে আসি। প্রদর্শনীতে এসেছিলাম লভ্যাংশে এই আত্মপ্রসাদটুকুই যা একটু থাকে, তার চেয়ে বেশি লাভ বড় একটা হয় না।

এবার একাই এসেছিলাম। ক্যাটালগখানা হাতে করে উত্তর থেকে দক্ষিণে হলঘরটা একবার পরিক্রমণ করলাম। স্কেচ, তেল রং, জল রং, পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় চিত্রকলার সবগুলি বিভাগ একবার করে ঘুরে দেখলাম, প্রবীণ ও তরুণ শিল্পী অনেকেরই ছবি প্রদর্শনীতে জায়গা পেয়েছে। আমার দু' একজন পরিচিত শিল্পী বন্ধুর ছবিও আছে।

মডার্ন আর্ট বিভাগটা যে আমাদের মত সাধারণ অশিক্ষিত চোখের পক্ষে বেশ খানিকটা দুর্বোধ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দুর্গমতা পার হবার জন্যে যে অধ্যবসায় দরকার তাই বা আমাদের ক'জনের আছে। বছরে একবার করে শুধু চোখের দেখা দেখে গেলে কি পৌরাণিক, কি আধুনিক, কোন ছবিই চেনা যায় না, বোঝা যায় না।

হঠাৎ একটি ছবি আমার চোখকে আকর্ষণ করল। সাদায় কালোয় দু রঙের ছবি। কি আরো দু একটা হালকা রং হয়তো ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক বলতে পারবো না। ওপর থেকে কিছু একটা গড়িয়ে

পড়ছে বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা অপ্রীতিকর, অস্বস্তিকর, এমন কি ভয়ঙ্করতার আভাস। সামান্য রং আর রেখার ব্যবহারে শিল্পী দর্শকের মনে এক অদ্ভুত ধরনের ভীতিরসের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন। ছবিটার দিকে আমি আরও কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলাম। তার পর ক্যাটালগের পাতা উল্টে উল্টে নম্বর মিলিয়ে চিত্র আর চিত্রকরের আরও কিছু পরিচয় নেওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। ক্যাটালগে তিনটি কথা পাওয়া গেল। ছবির নাম জলপ্রপাত, শিল্পী স্মরজিৎ মুখোপাধ্যায় (জব্বলপুর) দাম তিনশ টাকা। কিন্তু এই তিনটি কথাকে অবল[illegible] যে স্মৃতি-সমুদ্র আমার মনে উত্তাল হয়ে উঠল তারই দু চারটি তরঙ্গের কথা এখানে বলব।

আশ্চর্য, স্মরজিৎবাবু এখনো জলপ্রপাতের ছবি আঁকছেন। পনরো বছর আগে তাঁকে আমি এই প্রপাতের ছবি আঁকতে দেখেছি। তার পর এই প্রপাত নিয়ে কত কাণ্ড হল, জীবন মৃত্যুর দ্বৈতরূপ প্রতি-বিম্বিত হল এই প্রপাতের জলে। কিন্তু শিল্পীর আজও তৃষ্ণা মেটেনি, তৃপ্তি হয়নি। নানা রঙে, নানা পদ্ধতিতে জলপ্রপাতের ছবি এঁকেই চলেছেন, এঁকেই চলেছেন।

প্রথম দিকে সেই পনরো বছর আগে—তারও কয়েক বছর আগের আঁকা স্মরজিৎবাবুর যে সব ছবি দেখেছি তা এমন দুরূহ আর দুর্বোধ্য ছিল না। একটু গতানুগতিক হলেও জলধারাকে জলধারা বলে চেনা যেত। গাঢ় রঙের ভূমি ব্যবহার করতেন স্মরজিৎবাবু। নদী পাহাড় পর্বত, লতাপাতা ফুল, তাঁর পরিচিত স্বল্প পরিচিত নানা ধরনের নরনারীর মুখ কি পূর্ণ প্রতিকৃতি তখন স্মরজিৎবাবুর ক্যানভাসে স্থান পেত। নারীকে নারী এবং জলস্রোতকে জলস্রোত বলে দেখলেই চেনা যেত।

তারপর কালস্রোতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

স্মরজিৎবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা গোড়া থেকে বলি।

চাকরির সূত্রে আমি সেবার কলকাতার হেড অফিস থেকে মধ্য-প্রদেশের সেই মনোরম শহরটিতে বদলি হয়েছিলাম।

গাড়ি যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকল হাতঘড়ির দিকে চেয়ে সময়টা দেখে নিলাম, বেলা সাতটা। বাইরের দিকে তাকিয়ে অবশ্য সময় নির্ধারণের [illegible]। ম[illegible]মেঘে মেঘে আকাশ এখনো অন্ধকার। শেষ রাত থেকে বৃষ্টি শুরু [illegible], এখনো তা টিপটিপ করে পড়ছে।

আবহাওয়াটা বহিরাগতের পক্ষে ঠিক অনুকূল নয়। কিন্তু যতখানি অনুৎসাহ বোধ করবার কথা ছিল তা করলাম না। জল-বৃষ্টি আমার মোটামুটি ভালোই লাগে। আকাশের মেঘ আমার মনকে আচ্ছন্ন করেনি। কারণ নতুন জায়গায় আসতে পারার উদ্দীপনা মনের মধ্যে তখন অতিরিক্ত পরিমাণে সতেজ।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আর একবার স্টেশনটির নাম পড়লাম। ইংরেজি, হিন্দি আর মারাঠি তিনটি বর্ণলিপিতে স্টেশনের নামটি লিপিবদ্ধ আছে। স্ফুটতর কণ্ঠে নামটি আর একবার উচ্চা[illegible] করলাম, যেন জিভে চেখে নিতে চাই, কানে শুনে অনুভব করতে চাই সত্যি কতখানি মাধুর্য আছে শব্দটির মধ্যে।

মধ্যপ্রদেশের এই শহরটির সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় কিছুমাত্র নেই। মধুর সম্পর্কের কোন স্বজন বন্ধু যে এখানে অপেক্ষা করছেন তাও নয়। আমার সামান্যতম পরিচিত কোনও বাঙালী যে এখানে বাস করেন কলকাতায় বহু চেষ্টাচরিত্র করেও তেমন কোন যোগসূত্র সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু তখন পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আমি যে একটি অচেনা জায়গায় এসে পড়তে পেরেছি তাতেই আমি মুগ্ধ। কারণ পর্যটকের

মর্যাদা ভাগ্যে আমার এই প্রথম জুটেছে। এ শুধু নতুন একটি শহর দর্শন নয়, আত্মীয়-স্বজনের কাছে গর্ব করে বলবার মত একটি নিদর্শনও বটে।

ট্রেন থামবে এখানে আধ ঘণ্টাখানেক। কিন্তু নামবার জন্য সকলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। ঠেলাঠেলি চেঁচামেচির অন্ত নেই। জন দশ-বারো স্থূলকায় হিন্দুস্থানী দরজা দিয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বড় বড় গোটা পাঁচ ছয় ট্রাঙ্কে পথ অবরুদ্ধ। ভাবলাম ভিড় একটু কমুক। সময় তো আছেই, তাড়াতাড়ি করে কি হবে। কিন্তু দু' মিনিট যেতে না যেতেই দেখা গেলো আমিও স্যুটকেস ও বেডিংটা টানতে টানতে দোরের কাছে এসে তারস্বরে চিৎকার করছি 'কুলি, কুলি'। ধৈর্যশীল বলে আমার খ্যাতি আছে কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছে নিশ্চল গাড়ির মধ্যে দু' মিনিটের বেশি বসে থাকা আমার পক্ষেও দুঃসহ হল।

কুলির মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলাম। ভাঙা হিন্দিতে কোন রকমে তাকে বুঝিয়ে দিলাম আমাকে একটা টাঙ্গায় তুলে দিতে হবে।

আধ ঘণ্টাখানেক লাগলো যথাস্থানে পৌঁছতে। ততক্ষণে আধা-আধি ভিজে উঠেছি। অঞ্চলটির নাম অন্ধের দেও, অর্থ বোধ হয় অন্ধের দেবতা। বড় বড় রাস্তা ছেড়ে একটি সরু গলিতে যে ঢুকেছি তা দেখলাম। বাকি রইলো দেবতাকে দেখতে।

সাইনবোর্ডে ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিসের নাম লেখা আছে। বাড়ির সামনে এসে টাঙ্গাওয়ালাকে বললাম, 'রোখো।' তিনতলা বাড়ি। নীচের তলায় একটি স্টেশনারি দোকান। আমাকে দেখে একটি বছর পনরোর ছোকরা ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়েই দোতলার দিকে মুখ উঁচু করে ডাকতে

লাগলো—'কৃত্তিবাস, তোমরা নয়া বাবু আ' গয়া।' সদরের কোলাপসিব্‌ল্ গেট খুলে একটু বাদেই আর একটি ছেলে খাঁকি হাফ প্যাণ্ট পরে বেরিয়ে এলো। বছর আঠারো উনিশ বয়স, দেখতে অপেক্ষাকৃত বেঁটে, গায়ে কালো রংএর পোঁচটা কিছু বেশি, ঠোঁটের ওপর কোমল গোঁফের রেখা ঘন হয়ে উঠেছে। গালে তরুণ কচি দাড়ির আভাস স্পষ্টতর। দেখে বেয়ারা বলে বুঝতে ভুলে হলো না। হিন্দিতে তাকে নির্দেশ দিতে যাচ্ছি কৃত্তিবাস মৃদু একটু হেসে বললো—'আমি বাঙালী।'

বুঝলাম জাত নির্ণয়ে ভুল করেছি। কৃত্তিবাসকে অবশ্য অবাঙালী বলে ভুল করা ঠিক হয়নি। কিন্তু গাড়ির মধ্যে যার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে সে-ই হিন্দুস্থানী। ভাগ্যক্রমে একটি বাঙালীর সঙ্গেও দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। যখন এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে কৃত্তিবাস বেয়ারা ত' দূরের কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পেলেও হয়তো তখন তুলসী-দাসী ঢঙে সুর করে পড়তে শুরু করতাম।

টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। কৃত্তিবাসই বাক্স-বিছানা নিয়ে চলল। ছোট খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম তেতলায়। সিঁড়ির মুখেই একখানা বড় ঘর। চেআর টেবিল আলমারি আর খাট। ভেতরে ঢুকবো কিনা ভাবছি, ভেতর থেকে আমন্ত্রণ এলো—'আসুন, আসুন।' বড় একখানা টেবিল-আয়নার সামনে একটা রিভলভিং চেআরে বসে একটি সুদর্শন ভদ্রলোক দাড়ি কামাচ্ছিলেন। গায়ে পাতলা গেঞ্জি, কাঁধে দামী তোয়ালে। আমন্ত্রণ তিনিই করেছেন। ঢুকতেই আমার দিকে তাঁর সাবান মাখা মুখ ফেরালেন। বললেন—'আপনিই বোধ হয় অঞ্জনবাবু?' বললাম—'হ্যাঁ।'

খানিক দূরে আর একটা চেআরে বসে তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সের আর একজন ভদ্রলোক সুতোবাঁধা লম্বা রুল টানা একতাড়া

কাগজ দেখছিলেন, তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে অন্য ভদ্রলোক-টিকে দেখিয়ে বললেন—'উনি আমাদের ম্যানেজারবাবু, কমলাক্ষ চৌধুরী।' নমস্কার করে বললাম—'ও।' প্রতি নমস্কার করে কমলাক্ষবাবু মৃদু হেসে বললেন—'আর উনি আমাদের অ্যাকাউণ্টেণ্ট সাহেব নীলকান্ত ভট্টাচার্য।' নমস্কার বিনিময়ের পর নীলকান্তবাবু আবার সেই কাগজের ফাইলে মন দিলেন।

সামনের আর একটি চেআর দেখিয়ে দিয়ে কমলাক্ষবাবু বললেন—'দয়া করে চেআরটা টেনে নিয়ে বসুন অঞ্জনবাবু।'

চেআরটা আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে বসলাম। হঠাৎ দূর থেকে যেমন নিখুঁত সুন্দর বলে কমলাক্ষবাবুকে মনে হয়েছিল, কাছ থেকে অবশ্য ততখানি মনে হলো না। তবু সুপুরুষ বলে তাঁকে স্বীকার করতে হলো। ব্যাকব্রাস করা ঘন চুল, প্রশস্ত কপাল; নাক চোখের গড়ন বেশ টানা-টানা। পাতলা রক্তাভ ঠোঁট, গায়ের রং একটু অতিরিক্তই ফরসা, দীর্ঘ চেহারা। বয়স বছর ত্রিশের বেশি হবে না। দ্রুত হাতে গালের ওপর তিনি সেফটি রেজর টেনে গেলেন। আমি তিন চার মিনিট চুপ করে বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ মুখ ফেরালেন, তখনো তাঁর গালে মুখে খানিকটা খানিকটা সাবান লেগে রয়েছে।

স্মিতহাস্যে কমলাক্ষবাবু বললেন—'আপনার কালই জএন করবার কথা ছিল।'

বললাম —'হ্যাঁ, এলাহাবাদে একদিন হল্ট করলাম। কিন্তু নেমেই তো আমি চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম।'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'চিঠিটা আমরা পেয়েছি। গোড়া থেকেই বেড়াতে বেড়াতে এলেন বুঝি?'

বললাম—'বেড়ানো ঠিক নয়। একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল স্টেশনে। তিনিই ধরে নিয়ে গেলেন জোর করে।'

একটু বাদে কমলাক্ষবাবু বললেন—'কতদিন ঢুকেছেন ব্যাঙ্কে ?'

বললাম—'মাস তিনেক।'

নীলকান্তবাবু তাঁর সেই কাগজের তাড়া থেকে মুখ তুলে সবিস্ময়ে বললেন—'মাত্র ?'

তাঁর বিস্ময়টি প্রায় আর্তনাদের সীমা ছুঁয়ে গেলো।

তিনি বললেন—'এক্সপিরিএন্সড্ হ্যাণ্ডের জন্য হেড অফিসে আপনাকে লিখতে বলেছিলাম না কমলবাবু ?'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'আমি কি লিখিনি ভেবেছেন ?'

নীলকান্তবাবু বললেন—'তা আমি বলছি না, কিন্তু দেখুন দেখি কাণ্ড। সব ডিপার্টমেণ্টের কাজকর্ম জানা একজন লোক ছাড়া কি করে চালাব বলুন দেখি ?'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'বলছি তো দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন। আমি সব ডিপার্টমেণ্টের কাজই জানি বোধহয়।'

নীলকান্তবাবু একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে ফের সেই কাগজের তাড়ায় চোখ দিলেন।

কমলাক্ষবাবু সকৌতুকে মুহূর্তকাল সেদিকে একটু চেয়ে রইলেন, তারপর আমাকে বললেন—'আচ্ছা, আপনি যান অঞ্জনবাবু। বিশ্রামের পর চানটান করে তৈরি হয়ে নিন গিয়ে। দশটায় তো আবার অফিস। আচ্ছা, আজ না হয় এগারোটায় আসবেন। কৃত্তিবাস, দোতলায় বাবুদের ঘরটি দেখিয়ে দাও তো।'

কৃত্তিবাস দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল—'আসুন বাবু।'

দোতলায় নেমে দেখলাম সিঁড়ির মুখে আর একখানা বড় ঘর। বাইরে থেকে তালা বন্ধ।

কৃত্তিবাস বলল—'এটা আমাদের অফিস।'

করিডর দিয়ে বাঁদিকে এগিয়ে গেলাম। অপেক্ষাকৃত ছোট একখানা ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে কৃত্তিবাস বলল—'ওখানে থাকেন একাউন্টেন্ট বাবু।'

আর একটু এগিয়ে আর একখানা বড় ঘর চোখে পড়ল। কৃত্তিবাস বলল—'এটা আপনাদের বাবুদের জন্য।'

ম্যানেজারবাবু নয়, অ্যাকাউন্টেণ্টবাবু নয়, শুধু বাবু। 'আসুন আসুন' বলে আরো তিন চার জন বাবু এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী একটি ছেলেকে চিনতে পারলাম। হেড অফিসের আট নম্বর কারেণ্ট লেজারে ওকে দিনকয়েক কাজ করতে দেখেছি, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। সে এগিয়ে এসে বলল—'আরে আপনি? অঞ্জন রায় আসছেন বলে যখন শুনলাম, আমি ভেবেছিলাম মোটা মত ফরসা চেহারার সেই ক্লিআরিং-এর ভদ্রলোক।'

হেসে বললাম—'তাঁর নাম ধীরঞ্জন।'

'ওঃ তাই বলুন। আমার নাম বাদল বসু। আগে বলে দিলাম পাছে সাত নম্বরের দুর্বাদল সেনগুপ্ত বলে আমাকে ভুল না করেন, আসুন ঘরে আসুন। আস্তানাটা দেখুন এসে একবার।'

বেশ স্মার্ট স্ফূর্তিবাজ ছেলে। উনিশের ওপারে যাবে না বয়েস। রং কালো কিন্তু চেহারায় বেশ একটু সৌষ্ঠব আর মুখশ্রীতে তীক্ষ্ণতা আছে। ঘরে এসে ঢুকলাম। আয়তন বেশ প্রশস্তই। স্থানীয় খানকয়েক দড়ির তক্তাপোশ উত্তর-দক্ষিণে দুখানা করে পাতা। কলকাতার যে-কোন মেসঘরের মতো খাটের ওপর যার যার বিছানা গুটানো। আমার বিছানা সুটকেস দক্ষিণ দিকের একখানা পরিত্যক্ত খাটে রেখে দেওয়া হয়েছে।

বাদল বলল—'কাণ্ড দেখ কৃত্তিবাসের। বিছানাটি যে খুলবে তারও সময় পায়নি। আদরে আদরে একেবারে মাথায় উঠেছিস।'—বলে বাদল নিজেই আমার বিছানা খুলতে খুলতে বলল—'বাপরে বাপ, কি ভাবে বেঁধেছে। এমন শক্ত গেরোগুলি কে দিয়েছে অঞ্জনদা, বৌদি নাকি?'

বয়সে অন্তত সাত আট বছরের ছোট হবে। পরিচয়ও হয়েছে মিনিট কয়েক আগে মাত্র। বাদলের এই প্রগল্‌ভতায় আমি একটু বিস্মিত হয়ে রইলাম, তারপর হেসে বললাম—'বৌদি টৌদি কেউ এখনো আসেনি।'

বাদল আমার দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখল, তারপর বলল—'কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না। বৌদিদের বেলায় সিঁথির সিঁদুরে চেনা যায়, কিন্তু দাদাদের তো আর সিঁথি দেখে বুঝবার জো নেই যে, বৌদি এসেছেন কি আসেননি। আচ্ছা অঞ্জনদা, বৌদি কি একেবারেই আসেননি, না আমাদের ওই নিরুপমদার গৃহলক্ষ্মীর মত এসে চলে গেছেন?'

বললাম—'চলে গেছেন মানে?'

বাদল বলল—'মানে খারাপ কিছু নয়, ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু নিরুপমদাকে সেই যে চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস ধরিয়ে দিয়ে গেছেন তা আর দাদা ছাড়তে পারেননি! উনি এখনো রাত জেগে জেগে বৌদিকে চিঠি লেখেন। স্বর্গে চিঠি দিতে তো আর ডাকখরচা লাগে না, ভারি সুবিধা হয়ে গেছে।'

বছর তিরিশের শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক নিজের বিছানায় বসে সমনোযোগে কিছু লিখছিলেন, বাদলের শেষ কথায় বিদ্যুৎবেগে ফিরে তাকালেন, বললেন,—'বাদল সব কিছুরই একটা সীমা আছে। তোমার নামে আমি যদি ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট

না করি তো আমার নাম নিরুপম মুখার্জী নয়। যদি তাতে তোমার সংশোধন না হয়, তোমার বিরুদ্ধে আমি হেড অফিসে লিখব একথা জেনে রেখো।'

বাদল হাসি চাপতে চাপতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল—'যাই, চা-টার বন্দোবস্ত করা যায় কিনা দেখি।'

আমার সমবয়সী আর একজন ভদ্রলোক চান করতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'সত্যি, ছেলেটার লজ্জা-সম্ভ্রম, ভদ্রতা-অভদ্রতা বলতে কোন জ্ঞান তো নেই-ই, হৃদয় বলেও কোন বস্তু নেই। এখানে বদলী হয়ে আসার আগে নিরুপমবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন। সেজন্যে সবাই আমরা দুঃখিত, এ বয়সে কত বড় এক আঘাত পেয়েছেন ভদ্রলোক। কিন্তু ব্যাপারটা যেন বাদলের কাছে একটা ঠাট্টা তামাশার বিষয়।'

নিরুপমবাবু বললেন—'তাই দেখুন প্রমথবাবু, ভদ্রঘরের কোন ছেলে যে এমন ইতর হতে পারে আমি কোথাও আর দেখিনি।'

বললাম—'সত্যি এ নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা অন্যায়। তবে ছেলেমানুষ—।'

নিরুপমবাবু নীচু হয়ে আবার তাঁর চিঠি লিখতে লাগলেন।

প্রমথবাবু শিশি থেকে আর একটু গন্ধ তেল ঢেলে নিয়ে মাথায় মাখতে মাখতে বললেন—'বয়সে ছেলেমানুষ হলে কি হবে, কি রকম এঁচোড়েপাকা দেখলেন তো! আমি তো প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।'

মিনিট দুই বাদেই বাদল এসে বলল—'কৃত্তিবাসকে চা আনতে পাঠিয়ে দিলাম। বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে সাহস হয় না। সামনে নিন্দা-মন্দ তো ওঁরা আমার করেনই, ফাঁক পেলে ব্যাক-বাইটিং

করতেও ছাড়েন না। আপনাকে হয়তো এতক্ষণে প্রোজ্জ্বলিত করে তুলেছেন।'

নিরুপমবাবু আর প্রমথবাবু দুজনেই আমার দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে অর্থের ব্যঞ্জনা আছে। তারপর ফের দুজনেই নিজের কাজে মন দিলেন।

খানিক বাদে শালপাতার ঠোঙায় করে কৃত্তিবাস কিছু সিঙ্গাড়া নিয়ে এলো। কেটলি আর কয়েকটি চায়ের কাপ হাতে হিন্দুস্থানী এক বুড়ো এলো পেছনে পেছনে।

বাদল বলল—'কৃত্তিবাস, প্রত্যেক বাবুকে দেখে শুনে দাও।' যেন সবাইকে একটি বিশেষ ভোজে আপ্যায়িত করছে, বাদলের ভঙ্গিটি সেই রকম। প্রমথবাবু মহা বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—'আবার আমার জন্য কেন আনলে? দেখছ না চান করতে যাচ্ছি? আর ওগুলি কি খাদ্য? মিছিমিছি কতগুলি পয়সা নষ্ট করলে। আমার চা-টা ঢেকে রাখো কৃত্তিবাস, চান করে এসে নিচ্ছি।'

বাদল বলল—'কি আর করবেন প্রমথদা, বিদেশে এরকমই খেতে হয়। বৌদিকে যদি সঙ্গে আনতেন, তাহলে কি আর বাজে জায়গার পয়সা নষ্ট করতাম!'

প্রমথবাবু যেতে যেতে বললেন—'আবার বৌদি! বলছি যে বৌদি নেই, তবু তুমি বৌদি বৌদি করবে। আচ্ছা জ্বালা হয়েছে দেখছি!'

বাদল বলল—'কি ভাগ্য দেখুন! এতগুলি দাদা রয়েছেন কিন্তু একজনও বৌদি নেই। এখানে তো নেই-ই, বাড়িতেও নেই। নিরুপমদার সুবাদে যদিও বা একজন এসেছিলেন, তিনিও চলে গেছেন। আচ্ছা, নিরুপমদা যদি রাত জেগে চিঠি লিখতে পারেন আমি কেন তা বলতে পারব না?'

একটা সিঙ্গাড়ায় কামড় দিতে দিতে নিরুপমবাবু এবার প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন—'চিঠি নয় মূর্খ, ডায়রি। কেবল চিঠি আর বউ ছাড়া তো তোমার মাথায় আর কিছু ঢুকবে না।'

বাদল জিভ কেটে লজ্জার ভান করে বলল—'ছি ছি, বউ নয়, বউ নয় দাদা, বৌদি। রক্ষা যে বৌদি বৌদি করেই পাগল হয়েছি। বউ বউ করে পাগল হলে তো আপনারা ঘাড় ধরে বের করে দিতেন।'

উত্তর দেওয়া বৃথা মনে করে নিরুপমবাবু চায়ে চুমুক দিলেন।

বাদল এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'তাহলে আপনি স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত ?'

হেসে বললাম—'কেন, তোমার কি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ?' বাদল কথাটা ঘুরিয়ে বলল—'কি রকম যে কষ্ট, তা এক-আধ ঘণ্টা বাদেই টের পাবেন। রান্নাঘর আর রাঁধুনীর নমুনাটা একবার দেখে আসবেন চলুন।'

বললাম—'আগেই দেখে কি করব বাদল। চান টান করে একেবারে যথা সময়েই দেখা যাবে।'

বাদল বলল—'যথাসময়ে! তবেই হয়েছে। বারোটা-একটার আগে আর যথাসময় হবে না। ভেবেছেন বুঝি দশটার মধ্যে স্নানাহার সেরে একেবারে পান মুখে দিয়ে অফিসে যাবেন। সাধে কি আর বৌদি বৌদি করছি! তাঁদের কেউ থাকলে সেই ব্যবস্থাই হতো। কিন্তু এখানে গঙ্গাবাঈ-এর ওপর সব ভার। দশটার আগেই স্নান সারতে হয়। কিন্তু আহার কোনদিনই একটার আগে হয় না। দেখতে পাবেন একটু বাদে।'

বাদল গেঞ্জি খুলে স্নানের আয়োজন শুরু করল। তেলের শিশিটা আমার দিকে এগিয়ে বলল—'আর দেরি করে কি হবে ? কাপড় গামছা বার করুন, স্নানটান সেরে নিন এবার।'

তেল মাখতে মাখতে নিরুপমবাবুর কাছে ব্যবস্থাটার কথা বিশদভাবে শোনা গেল।

চাকর যদি বা মেলে ঠাকুর এখানে দুর্ঘট। উৎকলের রন্ধনশিল্পীরা এদেশের সন্ধান পায়নি। স্থানীয় রাঁধুনীরা কেউ কাজ করতে চায় না। বাঙালীর বাড়িতে রাঁধলে নাকি জাত যায়। এদিকে ব্রাহ্মণ না হলে জাত যায় অ্যাকাউন্টেণ্ট নীলকান্তবাবুর। বহু চেষ্টাচরিত্র করে গঙ্গাবাঈকে পাওয়া গেছে। সকালে আর এক জায়গায় সে কাজ করে। সেখানকার বাবুরা আবার অর্ডন্যান্স্ ফ্যাক্টরির বাবু। নটার আগেই বের হতে হয়। তাঁরাও বাঙালী এবং গঙ্গার পুরোনো মনিব। তাদের সে কি করে ছাড়ে! আর ছাড়লে একটা কাজের মাইনেয় তার চলেই বা কি করে? ফলে ন'টার আগে এখানে আসতে পারে না গঙ্গাবাঈ। উপায়ান্তর না দেখে এই ব্যবস্থাতেই কমলাক্ষবাবু রাজী হয়েছেন। বিশেষ অসুবিধাও কিছু নেই। অফিস আর রান্নাঘর তো এঘর-ওঘর। কাজ করতে করতে ফাঁকে ফাঁকে দু'একজন করে খেয়ে যায়, আবার গিয়ে কাজ করে। একেবারে পুরো গার্হস্থ্য আবহাওয়া।

নিরুপমবাবু বললেন—'বাধ্য-বাধকতা কিন্তু নেই অবশ্য। এ ব্যবস্থা যদি আপনার পছন্দ না হয় আধ মাইল দূরে পাঞ্জাবী হোটেল আছে একটি, সেখানে যেতে পারেন। সে হোটেলে ভাতও পাওয়া যায়। কিন্তু খরচ বেশি, খেয়েও পেট ভরে না।'

বললাম—'না না, তা কেন যাব, আপনাদের যেমন চলেছে, আমারও তেমনই চলবে।'

বললাম বটে কিন্তু এখানকার ব্যবস্থার কথা শুনে খুব স্বস্তিবোধ করতে পারলাম না।

নিরুপমবাবু বললেন—'প্রথম প্রথম একটু কেমন কেমন লাগবে,

তারপর দু'দিনে সব সয়ে যাবে দেখবেন। কপালে কষ্ট না থাকলে এসব জায়গায় কি আর কেউ আসে মশাই ? সব জেনে শুনে, সব রকম দুর্ভোগের জন্যে তৈরি হয়েই এসেছি। বাড়িতে টিকতে পারলাম না অঞ্জনবাবু।'

নিরুপমবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। বাদল আর প্রমথবাবুর কাছে ইতিপূর্বে আভাস পেয়েছিলাম ব্যাপারটির, তাই চুপ করে রইলাম।

আবেগ সংবরণ করে নিরুপমবাবু বললেন—'কিন্তু আপনি কেন এলেন ?'

'কি আর করব বলুন। বদলি ক'রে দিল। ভাবলাম এই উপলক্ষে একটু ঘুরে টুরেও আসা যাবে।'

নিরুপমবাবু আর কোন কথা না বলে চান করতে চলে গেলেন। মনে মনে হয়তো ভাবলেন আমিও বাদলের দলের।

যস্মিন দেশে যদাচারঃ। চান সেরে আমিও দশটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। কমলাক্ষবাবুর এক ঘণ্টার অনুগ্রহ গ্রহণ করবার ইচ্ছা হলো না।

দেখলাম নীলকান্তবাবু দশটার আগেই এসে চেআরে বসেছেন, কমলাক্ষবাবুর নাকি এখনো স্নান আর প্রসাধন শেষ হয়নি।

ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ে সহকর্মীরা পর পর নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসলেন। ক্যাশিআর দু'জন দেখলাম স্থানীয় ভদ্রলোক। বৃষ্টি মাঝখানে থেমেছিল, আবার টিপটিপ করে পড়তে লাগলো। ছাতা মাথায় দু'একজন হিন্দুস্থানীকে দেখা গেল চেক ভাঙাতে এসেছে। নীলকান্তবাবুর কাছ থেকে ক্লিআরিং-এর চার্জ বুঝে নিলাম। খানিক বাদে কৃত্তিবাস এসে বললো, 'অঞ্জনবাবু, গঙ্গাবাঈ ডাকছে আপনাকে।'

তার পিছনে পিছনে এলাম ভিতরে, মানে রান্নাঘরে। একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। পায়ের শব্দে

ফিরে তাকালো। একটু যেন চমকে উঠলাম। চল্লিশ পেরিয়ে গেছে বয়স। এ বয়সে মুখের এমন কমনীয়তা সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। বিশেষতঃ বাঙালীর চোখ যখন অবাঙালীর মুখে গিয়ে পড়ে। গঙ্গাবাঈয়ের মুখকে সুন্দর ঠিক বলতে পারি না। মুখের ডৌলটি সুঠাম হলেও নাক-চোখের গড়ন তেমন সুন্দর নয়। কিন্তু এ মুখ সুন্দর কি অসুন্দর সে প্রশ্ন মনে আসে না। যৌবন অতিক্রান্তা একটি সাধারণ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের মুখে এমন বিষাদ-গভীর জীবন-রহস্যের ছাপ কি করে পড়লো সেই বিস্ময়টুকুই আমি সহজে কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

আমাকে চেয়ে থাকতে দেখে গঙ্গাবাঈ একটু যেন লজ্জিত হল। মাথার আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে প্রাদেশিক হিন্দীতে বলল—'ক্যা, আপহি ওহি নয়াবাবু?'

বললাম—'হ্যাঁ।'

গঙ্গাবাঈ ছোট্ট বাটিতে খানিকটা গরম দুধ আর পাতায় ক'রে দুটি প্যাঁড়া এগিয়ে দিয়ে আমাকে জানাল, কৃত্তিবাসকে দিয়ে সে আমার জন্য এ সব আনিয়ে নিয়েছে। এখানে খানাপিনা হয় অনেক দেরিতে। আমার তো অভ্যাস নেই, কষ্ট হবে।

মাত্র এই কয়টি সামান্য কথা, কিন্তু বলবার ভঙ্গি খুবই অপ্রত্যাশিত, স্নেহ-কোমল একটি সুর আমার কানে এসে লাগলো।

বিদেশে এলে আমাদের চোখই যে শুধু সজাগ হয়ে ওঠে তা নয়, মনের অনুভূতিও তীক্ষ্ণ হয়। যা দেখি তাতেই যেন রং লাগে, যা পাই তাতেই যেন অপূর্বতার স্বাদ মেলে।

দুই

ভেবেছিলাম শহরটা একবার ঘুরে দেখব। কিন্তু সে সুযোগ যে খুব তাড়াতাড়ি মিললো তা নয়। গাড়িতেই বেশ ঠাণ্ডা লেগেছিল। সর্দি আর মাথাধরার ভাবটা ছিল আগে থেকেই। তারপর পুরোদমে স্নানাহার আর সইল না। শেষ রাত্রে জ্বরটা ভাল রকমেই অনুভব করলাম।

খবর পেযে নীলকান্তবাবু অফিসে যাওয়ার আগে এলেন খোঁজ নিতে। কপালে হাত রেখে তাপ পরীক্ষা করলেন, তারপর অপ্রসন্ন মুখে বললেন—'আচ্ছা মুশকিলেই ফেললেন দেখছি! কাল জএন করলেন, আর আজই জ্বর!'

তৃতীয় দিনেও যখন জ্বরটা ছাড়ল না বরং বমির উদ্বেগের মত আরও দু-একটা উপসর্গও এসে যোগ দিল, কমলাক্ষবাবু ধমক দিলেন আমার রুমমেটদের—'কি করছেন আপনারা? অসুখ হলে ডাক্তার ডাকতে হয়, তাও কি বলে দিতে হবে?'

প্রমথবাবু বললেন—'আমরা তো কাল থেকেই ডাক্তারের কথা বলছি, কিন্তু অঞ্জনবাবুই বললেন—দেখা যাক দু-একটা দিন। এ রকম জ্বর নাকি ওঁর মাঝে মাঝে হয।'

কমলাক্ষবাবু সে কথায় কান দিলেন না, বাদলকে বললেন, 'তুমিই যাও দেখি, এক্ষুনি নিযে এসো স্মরজিৎবাবুকে।'

বাদল বললে—'কিন্তু ডাক্তারবাবু কি এখনি নীচে নামবেন? শুনেছি এই বিকেলের দিকটায় তাঁর ছবি আঁকার সময়। রাত আটটার আগে বের হন না রোগী দেখতে।'

কমলাক্ষবাবুর কি মনে পড়ে গেল। হেসে বললেন—'ওঃ, তাই তো, আচ্ছা যাক তোমার গিয়ে দরকার সেই। আমিই বলে দিচ্ছি ফোনে।'

বাদল পাশে এসে বসল। বললাম, 'এখানকার ডাক্তারবাবু কি ছবিও আঁকেন নাকি?' বাদল মুখ টিপে হাসল—'হ্যাঁ, সেই রকমই একটা বাতিক আছে শুনেছি। ভারি অদ্ভুত কম্‌বিনেশন; একই সঙ্গে ডাক্তার আর আর্টিস্ট, কলাশিল্পী আর বিজ্ঞানী।'

রাত আটটার কিছু আগেই অবশ্য ডাক্তারবাবু এসে হাজির হলেন। কমলাক্ষবাবু হয়তো বিশেষ করে অনুরোধ করে থাকবেন। সাহেবী পোশাকে একটু স্থূলকায় বত্রিশ তেত্রিশ বছরের একজন শ্যামবর্ণ বাঙালী ভদ্রলোক। মুখশ্রীতে কোমল বাঙালীয়ানার চাইতে কাটখোট্টা হিন্দুস্থানী ধরনটাই বেশি। বোধহয় দীর্ঘদিন প্রবাসে আছেন। চেআরটি আমার তক্তাপোশের কাছে আর একটু টেনে নিয়ে বললেন—'কবে হলো জ্বর? দেখি, হাতখানা দিন দেখি একটু।'

জিজ্ঞাসার জবাবে আনুপূর্বিক বিবরণ বললাম জ্বরের, বললাম উপসর্গগুলির কথা। ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে বললেন—'জিবটি দেখান এবার।'

দেখালাম। স্টেথোসকোপ লাগিয়ে তিনি একটু বুক পরীক্ষা করলেন, তারপর পাশে দাঁড়ানো বাদলের দিকে চেয়ে বললেন—'দেখি একটু কাগজ দিন তো।'

খচখচ করে ওষুধের নাম লিখলেন কাগজে। তারপর সেখানা বাদলের হাতে দিয়ে বললেন—'আনিয়ে নেবেন ডিসপেনসারি থেকে।'

ভিজিটের টাকা কটি ব্যাগের ভিতরে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। কমলাক্ষবাবু কোথায় বেরিয়েছিলেন, এসে পৌঁছলেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি, বললেন—'এই যে ডাক্তারবাবু, একটা জরুরী ব্যাপারে বের হতে হয়েছিল, দেরি হয়ে গেল একটু, কেমন দেখলেন পেশেণ্ট ?'

'সামান্য জ্বর। চিন্তা করবার মত কিছু নেই।'

কমলাক্ষবাবু বললেন,—'না থাকলেই ভালো। ভদ্রলোক এসেই জ্বরে পড়েছেন। এদিকে লোকজন কম। কাজকর্মের ভারি অসুবিধা হচ্ছে।' সে কথার কোন জবাব না দিয়ে স্মরজিৎবাবু বললেন,—'ক'দিন ধরে যাচ্ছেন না কেন আপনি, লেখা প্রায়ই বলে আপনার কথা।'

কমলাক্ষবাবু বললেন,—'যাব একদিন। কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাছাড়া গেলে তো আপনারও কাজের ব্যাঘাত।'

স্মরজিৎবাবু একটু হাসলেন,—'না, না, ব্যাঘাত কিসের ? আপনি গেলে আমরা সবাই বেশ খুশি হই।'

শুয়ে দুজনের কথা শুনতে লাগলাম। পারিবারিক প্রসঙ্গে ডাক্তারবাবুর নৈর্ব্যক্তিক ভাবটা বেশ একটু বদলেছে। এবার আর অপরিচিত কোন রোগীর সঙ্গে কথা বলছেন না, বলছেন ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুর সঙ্গে।

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ কমলাক্ষবাবুর খেয়াল হল তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেননি। তিনি এবার বললেন—'এঁর কথা আগেই শুনে থাকবেন—ডাক্তার স্মরজিৎ মুখোপাধ্যায়। আমাদের এখানকার বিশিষ্ট হিতৈষী বন্ধু। এখানকার পুরনো বাসিন্দা। শুধু আমরা নয়, এখানকার প্রবাসী বাঙালীরা সবাই ওঁকে চেনে। সবাই ওঁর কাছে উপকৃত।'

একটু থামলেন কমলাক্ষবাবু। বোধ হয় হিসেব করে দেখলেন সবগুলি কমপ্লিমেণ্ট দেওয়া হলো কিনা। তারপর হঠাৎ যেন কি একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন—'ভালো কথা, ইনি কেবল নামজাদা ডাক্তারই নন, একজন ভালো আর্টিস্ট, চমৎকার ছবি আঁকেন।'

স্মরজিৎবাবু বাধা দিয়ে বললেন—'থাক, থাক, ওসব থাক।'

আমি বললাম—'জানি; ওঁর ছবি আমি দেখেছি।'

এবার বেশ উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকালেন স্মরজিৎবাবু—'দেখেছেন? কোথায় দেখলেন আপনি?'

বললাম,—'পৌষের রূপশ্রীতে আপনার একখানা ছবি বের হয়েছিল। 'নর্মদা প্রপাত'। শিল্পীর নাম ছিল স্মরজিৎ মুখোপাধ্যায়। বোধহয় আপনারই ছবি!'

স্মরজিৎবাবু এবার খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন। 'বেরিয়েছিল তাহলে! আশ্চর্য!' সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ—'অথচ দু' মাসের মধ্যে আমাকে একখানা কপিও পাঠালে না তারা। খবর পর্যন্ত একখানা চিঠি লিখে দিলে না। অপূর্ব শিষ্টাচার আর ভদ্রতাবোধ আপনাদের কলকাতার কাগজওয়ালাদের।' আমি বললাম—'হয়তো ডাকের গোলমালে হারিয়ে গিয়ে থাকবে। কাগজের কর্তৃপক্ষকে আমি জানি। তাড়াতাড়ি একখান কপি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে লিখে দেব।'

স্মরজিৎবাবু খুব খুশি হয়ে বললেন—'হ্যাঁ, দেবেন তো। তাহলে ছবিখানা আপনি দেখেছিলেন? কেমন লেগেছিল মনে আছে আপনার?' বললাম—'নিশ্চয়ই, মনে আছে বেশ ভাল লেগেছিল।'

কিছুক্ষণ পূর্বের সেই নৈর্ব্যক্তিক গম্ভীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তারপর রূপশ্রীর সেই সংখ্যাখানি সপ্তাহখানেকের মধ্যে পেয়ে গেলেন স্মরজিৎবাবু, আমিও ততদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম। এমনি করে অল্প সময়ের মধ্যে স্মরজিৎবাবুর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে গেল।

কমলাক্ষবাবু বললেন—'এবার একদিন দেখা করে আসুন ওঁর সঙ্গে। ডাক্তারবাবু বলছিলেন আপনার কথা। আপনার লেখা-টেখার অভ্যাস আছে তাও ওঁদের আমি বলেছি।'

লজ্জিত হয়ে বললাম—'ওসব আবার কেন বলতে গেলেন। আপনি তো শুনেছি যান মাঝে মাঝে। আপনার সঙ্গেই যাবো।'

কমলাক্ষবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—'কেন, ঠিকানা নিয়ে ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারবেন না? এই তো রাইট টাউনেই ওঁর বাড়ি। না হয় বাদল-টাদল কাউকে নিয়ে যাবেন। কৃত্তিবাসও চেনে।'

কমলাক্ষবাবুর এই আকস্মিক বিরক্তিতে বিস্মিত হয়ে বললাম—'আচ্ছা, ওদের কারো সঙ্গেই যাব না হয়।'

চলে যাচ্ছিলাম, কমলাক্ষবাবু ফের ডাকলেন—'শুনুন'। ফিরে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন—'আচ্ছা, আমার সঙ্গেই যাবেন, আজ সন্ধ্যের পর।'

বেরুবার আগে প্রায় আধঘণ্টা ধরে সাজসজ্জা করলেন কমলাক্ষবাবু। সুদর্শন পুরুষ। যে কোন বেশেই মানায়, সুটের চেয়ে ধুতি পাঞ্জাবিতে তাঁর চেহারা আরো যেন বেশি খোলে। মানুষটি খুব শৌখীন। খাট, চেআর, ড্রেসিং টেবিল, বুকসেল্‌ফে তাঁর ঘরখানা চমৎকার করে সাজিয়েছেন। কৃত্তিবাস আর গঙ্গাবাঈ-এর ওপর কড়া হুকুম রয়েছে যেন কোন কিছুতে ধুলো না পড়ে! যেন ছোটখাট আসবাবও এদিক ওদিক একটুও না হয়। অবশ্য জিনিসগুলি কেনা নয়, ভাড়া করা। কেনবার কোন মানে হয় না, কখন বদলির হুকুম

আসে ঠিক নেই। এর আগেকার ম্যানেজারের আমলে এসব নাকি প্রায় কিছুই ছিল না। সাদাসিধে সন্ন্যাসীর মত তিনি থাকতেন। কমলাক্ষবাবু এখনো অবিবাহিত। তিনি নাকি বিপত্নীক নিরুপমবাবুকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, তাঁর এই রাজসিক রুচি তাঁর নিজের জন্য নয়, ব্যাঙ্কের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

মটকার পাঞ্জাবি আর চুলপেড়ে মিহি ধুতিতে সত্যিই চমৎকার দেখাল কমলাক্ষবাবুকে। পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল অবধি সযত্নে ত্রাস করা। কোথাও কোন খুঁত নেই প্রসাধনে।

আমার আটপৌরে বেশবাসের দিকে তাকিয়ে তিনি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

গেটের কাছে টাঙ্গা দাঁড়ানো ছিল। কমলাক্ষবাবু তাতে উঠে বললেন—'আসুন।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটি বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির সামনে এসে কমলাক্ষবাবু বললেন—'আসুন অঞ্জনবাবু।' একটি হিন্দুস্থানী চাকর দাঁড়িয়েছিল সামনে। কমলাক্ষবাবুকে দেখে গেট খুলে দিয়ে সে বললে—'আইয়ে ম্যানেজার সাব।' তারপর ভেতরে চলে গেল খবর দিতে।

একটু পরেই স্মরজিৎবাবু নেমে এলেন। গায়ে ফতুয়া, পরণে ছোট ধুতি। ঘরোয়া বেশে আরো যেন একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে তাঁকে। স্মিতহাস্যে বললেন—'এই যে, আসুন আসুন।'

পিছনে পিছনে ঢুকলাম বাড়ির ভিতরে। প্রশস্ত উঠানের দুই দিকে বাঁখারির বেড়া গোলাপের ঝাড়। লনে সরল দুর্বার আচ্ছাদন। লাল সুরকির পথ ঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।

স্মরজিৎবাবু একটু হেসে আমার দিকে তাকালেন—'কি রকম?

কোয়াইট অল্ রাইট নাউ—' তারপর কমলাক্ষবাবুকে বললেন—'দেখলেন তো, আমার ওষুধেও রোগ সারে।'

কমলাক্ষবাবু হেসে বললেন—'ভারি আশ্চর্যের কথা তো! ডাক্তারের ওষুধে রোগ সারে।'

স্মরজিৎবাবু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হিন্দুস্থানী চাকরটিকে ডেকে বললেন—'মেমসাবকে খবর দাও রঙলাল। বল গিয়ে কমলাক্ষবাবু এসেছেন।'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'থাক্ না, তিনি হয়তো ব্যস্ত আছেন।'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'এসময়ে এমন কিছু ব্যস্ত থাকবার কথা নয়। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।'

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম—'আপনার ছবি দেখতে এলাম ডাক্তারবাবু। যদি দয়া করে—'

ভেতর থেকে পর্দা সরিয়ে একটি মহিলা ঘরে ঢুকলেন। তন্বী ছিপছিপে চেহারা, সুগৌরী। উজ্জ্বল দুটি চোখ, দেখলেই মনে হয় বেশ বুদ্ধিমতী।

স্মরজিৎবাবু মৃদু হেসে বললেন—'ইনি কিন্তু আমার আঁকা ছবি নন অঞ্জনবাবু।' লজ্জিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি কি বেশিক্ষণ তাকিয়েছিলাম! শুনলাম মিসেস মুখার্জী ছোট্ট একটি শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করলেন—'আঃ।'

প্রয়োজন ছিল না, তবু রীতি রক্ষার জন্য কমলাক্ষবাবু সংক্ষেপে আমার একটু পরিচয় দিলেন।

স্মরজিৎবাবু বললেন—'তোমাকে বলিনি শ্রীলেখা? রূপশ্রীতে আমার সেই ছবিখানা বেরিয়েছে সে খবর ইনিই আমাকে প্রথম দিয়েছিলেন।'

মিসেস্ মুখার্জী মৃদু হেসে বললেন—'শুনেছি আপনার সঙ্গে নাকি জানাশুনাও আছে পত্রিকাটির?'

বললাম—'তা আছে।'

মিসেস্ মুখার্জী বললেন—'আপনি খবর না দিলে সংখ্যাটি হয়তো আমাদের কাছে আর পৌঁছতোই না।

বললাম—'বিষয়টি সামান্য। তার জন্যে অত বলছেন কেন? ছবিখানি সত্যিই আমার খুব ভালো লেগেছিল। ছবি দেখতে দেখতে একেবারে জলপ্রপাতের দিকে চলে এসেছি।'

স্মরজিৎবাবু খুব খুশি হলেন। মিসেস মুখার্জী বললেন,—'ওঁর এখানকার বন্ধুবান্ধবরাও ছবিখানির বেশ প্রশংসা করেছিলেন।'

তারপর তিনি কমলাক্ষবাবুর দিকে তাকালেন—'আপনি দেখেননি সে ছবিখানা?'

কমলাক্ষবাবু একটু হাসলেন—'দেখেছি বইকি! ছবি দেখবার চোখ থাকলেও মতামত দেবার অধিকার কি সবায়ের থাকে?'

মিসেস মুখার্জী বললেন—'তাই নাকি? নাহয় একটু অনধিকারচর্চাই করলেন।'

স্মরজিৎবাবুর ড্রইংরুমে বসে কথা হচ্ছিল। কাছাআঁটা মাঝবয়েসী একটি মারাঠী স্ত্রীলোক চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার হাত থেকে ওগুলি নামিয়ে নিয়ে মিসেস মুখার্জী নিজেই চা আর খাবার আমাদের সামনে ধরে দিলেন।

স্মরজিৎবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—'আঃ, আবার কে ডাকাডাকি করছে এ সময়ে? যাও তো রঙ্গা—।'

মিসেস মুখার্জী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'ও নতুন এসেছে। ও কেন পারবে ফোন ধরতে, আমিই যাচ্ছি।'

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়ে বললেন—'আহা তুমি কেন, রঙলালই ধরুক গিয়ে ফোনটা! কি ব্যাপার শোনাই যাক না আগে।' কিন্তু মিসেস

মুখার্জী ততক্ষণে পাশের ঘরে চলে গেছেন। স্মরজিৎবাবু একবার সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। একটু বাদেই ফিরে এলেন মিসেস মুখার্জী। গম্ভীর মুখে বললেন—'মথুরানাথ ত্রিবেদী ফোন করছিলেন, তাঁর স্ত্রীর অবস্থা ভালো না। তোমাকে এক্ষুনি যেতে বললেন।'

স্মরজিৎবাবু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলে উঠলেন—'তুমি যখন ফোন ধরেছ তখনি বুঝেছি, মরণাপন্ন রোগী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।'

মিসেস মুখার্জী শান্তভাবে বললেন—'ডাক্তারের বাড়িতে রোগী ছাড়া আর কার ফোন আসবে ভেবেছিলে?'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'বলে দিয়েছ তো আধঘণ্টাখানেক বাদেই আমি যাচ্ছি।'

মিসেস মুখার্জী বললেন—'আধঘণ্টা বাদে কি! বলেছি পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই তুমি মোটরে করে পৌঁছে যাবে, তাঁরা যেন কোন চিন্তা না করেন।'

স্মরজিৎবাবু কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হাসবার চেষ্টা করে বললেন—'তাঁরা একটু না হয় ভাবলেনই। তুমি বরং একটু কম ভেবো।'

মিসেস মুখার্জী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মারাঠী স্ত্রীলোকটিকে বললেন—'দাঁড়িয়ে কি দেখছ রঞ্জা, টেবিলটা পরিষ্কার করে নাও।'

অপ্রতিভ হয়ে টি-সেট্‌টি গুছিয়ে নিল রঞ্জা। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চোখে পড়ল বয়েস পেরিয়ে গেলেও কচি পাতাওয়ালা একটি গোলাপের কুঁড়ি সযত্নে সে খোঁপায় গুঁজে রেখেছে।

কমলাক্ষবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—'এবার আমরাও চলি ডাক্তারবাবু।'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'কিন্তু অঞ্জনবাবু ষ্টুডিওটা দেখবেন বললেন যে।'

মিসেস মুখার্জী আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—'স্টুডিও দেখবার জন্যে অঞ্জনবাবুর আর একদিন নিমন্ত্রণ রইল।' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন—'উনি কিছু মনে করবেন না তাতে। তুমি ভেবো না।'

বললাম—'না, না। ডাক্তারের কর্তব্য সবচেয়ে আগে।'

স্মরজিৎবাবু অদ্ভুত একটু হাসলেন—'ভুল করলেন, তারও আগে ডাক্তারের স্ত্রীর কর্তব্য।'

মুহূর্তকাল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন দুজনে। তারপর দ্রুতবেগে ভিতরে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু।

মিসেস মুখার্জী হাসবার চেষ্টা করে নালিশের ভঙ্গিতে বললেন—'কিছুদিন ধরে এমনি হয়েছে ওঁর মেজাজ। কথায় কথায় রাগ করেন। ছবির কাজ, ছবির আলোচনা ছাড়া আর কিচ্ছু করতে চান না।'

কমলাক্ষবাবু অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত অনুযোগের সুরে বললেন—'আপনিই বা অত ব্যস্ত হলেন কেন? কোন্ কেস্ কত সিরিআস তা তো উনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।'

মিসেস মুখার্জী মাথা নাড়লেন—'না, আপনি তো জানেন সিরিআস কেসগুলির কথাও আমাকে আজকাল জেনে রাখতে হয়।'

কমলাক্ষবাবু হেসে বললেন—'তার চেয়ে আপনিই নিজেই প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করুন না।'

মিসেস মুখার্জীও হাসলেন—'তার সুযোগ পেলাম কই?'

আমরা বিদায় নেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। মিসেস মুখার্জী বললেন—'সে কি, আপনারা বসুন। কোন কথাই তো হল না।' আমি বললাম—'আর একদিন আসব।'

বাইরে এসে কমলাক্ষবাবু বললেন—'কোনদিকে যাবেন এবার?' বললাম—'গেলেই হয় বাড়ির দিকে।' কমলাক্ষবাবু বললেন—'সরি, ব্যাঙ্কের পার্টি হীরালাল মতিলালের বাড়িতে একবার যেতে হবে। আপনার সঙ্গে যেতে পারছিনে। আপনি চিনে যেতে পারবেন তো?' বললাম—'তা পারব।'

অন্ধের দেও-এর দিকে এগোতে এগোতে ভাবলাম, কমলাক্ষবাবু কার ওপর ক্ষুণ্ণ আর অপ্রসন্ন হলেন! আমার ওপর না ওঁদের ওপর! স্মরজিৎবাবুর স্টুডিও না দেখাতে পারার জন্যে নিশ্চয়ই নয়। ও স্টুডিও হয়তো তিনি অনেকবার দেখেছেন। ছবি সম্বন্ধে, বিশেষ করে স্মরজিৎবাবুর ছবি সম্বন্ধে তাঁর যে কোন ঔৎসুক্য আছে তা তো বোধ হলো না। না থাকা তেমন বিস্ময়ের কিছু নয়। স্মরজিৎবাবুর ছবি হয়তো একাধিকবার তিনি দেখেছেন। আর যেন মনে হলো শ্রীলেখা দেবীর অমন আকস্মিক বিদায় দেবার ভঙ্গিটাকেই কমলাক্ষবাবু ঠিক প্রসন্ন মনে নিতে পারেননি। আমার কথা বলতে গেলে, ক্ষোভের চেয়ে বিস্ময় আর কৌতুকই আমি বোধ করছিলাম বেশি। রোগীর বাড়ি পাঠিয়ে ডাক্তার স্বামীকে কর্তব্যে অবিচল রাখবার অতিরিক্ত আগ্রহটা শ্রীলেখা দেবীর মত ধীমতী মেয়ের পক্ষে একটু যেন অদ্ভুতই লাগছিল আমার কাছে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শুধু ডাক্তারবাবুর স্ত্রীই নন, দায়িত্বশীলা অভিভাবিকাও। স্মরজিৎবাবুর বিরক্ত আর বিব্রত মুখখানাও মনে পড়ল। দুজন বাইরের লোকের সামনে লজ্জিতই যেন হচ্ছিলেন তিনি। কি জানি বিরক্তি আর লজ্জাটা হয়তো আমরা বাইরের দুজন লোক ছিলাম বলেই। নহিলে চারু-দর্শন সুভাষিনী স্ত্রীর কাছ থেকে কর্তব্যের পাঠ নিতে তিনি বোধ হয় অনভ্যস্ত ন'ন।

সন্ধ্যার পর রাত বেশ একটু হয়েছে। আলো জ্বলছে রাস্তার

দু'দিকের বাড়িগুলিতে। জানালার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল একটি তরুণী মেয়ে পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, আর আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়াচ্ছে কোলের শিশুর। গার্হস্থ্যযাত্রার ভারি পরিচিত একটুকরো ছবি। কিন্তু রাত্রির আলোয় এই অচেনাপ্রায় শহরে রহস্যময় মনে হলো দৃশ্যটিকে। আর হঠাৎ নিজেকে নিঃসঙ্গ আর নির্বান্ধব লাগল সেই মুহূর্তে। খেয়াল হলো ঘুরে ঘুরে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ আর অপরিচ্ছন্ন একটি গলির মধ্যে এসে পড়েছি। এলোমেলো ছোট ছোট মাটির ঘর। অনুজ্জ্বল আর নিষ্প্রভপ্রায় আলোর দু'একটি ক্ষীণরেখা মাটিতে এসে পড়ছে। ফিরে যাব না সামনে বেরুবার রাস্তা আছে কি না কাউকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি হঠাৎ দ্রুতপায়ে একটি স্ত্রীলোক এদিকে এগিয়ে আসছে। আরো কাছে আসতে চিনতে পারলাম আমাদের গঙ্গাবাঈ। বললাম—'একি, তুমি এখানে! কাজে যাও নি?' গঙ্গাবাঈ হিন্দুস্থানীতে বলল—'না, নয়াবাবু। বাবুকে বলে এসেছি যেতে পারব না এবেলা। বৌটার ভারি অসুখ।'

দেখলাম সত্যিই গোল একটা শিশি গঙ্গাবাঈর হাতে। বললাম, —'দাওয়াই আনতে গিয়েছিলে বুঝি ডাক্তারখানায়।'

গঙ্গাবাঈ বলল—'হ্যাঁ বাবুজী।'

কি অসুখ জিজ্ঞেস করতে শুনলাম ক'দিন ধরেই জ্বরে ভুগছে গঙ্গাবাঈর ছেলের বৌ। আজ একটু কাতর হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও গঙ্গাবাঈ কাজে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তারাবাঈ ভারি অবুঝ মেয়ে। কিছুতেই তাকে ছাড়ে নি আজ। কাঁদাকাটি করে বলেছে গঙ্গাবাঈ চলে গেলে একা একা সে নাকি আজ আর বাঁচবে না। মেয়েটা অমন যদি অবুঝের মত করে—গঙ্গাবাঈ কি করে নকরি করবে। বাড়ির কারো অসুখ-বিসুখের দোহাই দিয়ে কাজে কামাই

করতে ভারি লজ্জা করে গঙ্গাবাঈর। বউ এবার একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দেবে সে। কিছুতেই আর রাখবে না এখানে।

পুত্রবধূর ওপর যতই বিরক্তি প্রকাশ করুক গঙ্গাবাঈ তার রূঢ় কথার আড়ালে অন্তরের বাৎসল্য আমার কাছে গোপন রইল না।

একটু চুপ করে বললাম—'তোমার ছেলে কোথায় ?'

গঙ্গাবাঈ যেন জ্বলে উঠলো।—'সে বদমাশটার কথা আর বলবেন না বাবুজী। সে জাহান্নামে গেছে।'

বাদলের কাছে একটু শুনেছিলাম কথাটা। গঙ্গাবাঈ-এর ছেলে বেনীর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। মা আর বৌকে খেতে দেয়ই না, বরং গঙ্গাবাঈ যা রোজগার করে তাও এক একদিন মাতাল হয়ে এসে জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়।

বললাম—'আচ্ছা, এবার তা হলে আমি যাই।'

গঙ্গাবাঈ যেন একটু ইতস্তত করল, তারপর বলেই ফেললে—'এই তো সামনেই আমার ঘর। একেবারে দোরের কাছে এসে ফিরে যাবেন নয়াবাবু ? ভেতরে ঢুকবেন না একবার ? আপনার ঢুকবার মত জায়গা এটা নয়। আদর যত্ন করবার মতও কিছুই নেই আমার। কিন্তু আপনিতো আমার ছেলের মত বাবুজী।'

গঙ্গাবাঈর বলবার ভঙ্গিতে মনটা কেমন করে উঠল। মনে পড়ল দুটো মেসে রান্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যখনই একটু সময় পেয়েছে গঙ্গাবাঈ, আমার রোগশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাতাস করেছে মাথায়, ওষুধটুকু পথ্যটুকু এগিয়ে দিয়েছে মুখের কাছে। বললাম—'তোমার ঘরে যাব তাতে আপত্তি কি আছে। কিন্তু রাত হয়েছে, তাছাড়া বাড়িতেও তোমার অসুখবিসুখ শুনলাম। তাই—'

গঙ্গাবাঈ বাধা দিয়ে বলল—'তাতে কি বাবুজি আপ আইয়ে।'

ঘরের মাঝখানে দেওয়াল তুলে ছোট ছোট তুটি কামরা করে নিয়েছে গঙ্গাবাঈ। তার একটির ভেতরে নিয়ে গিয়ে জলচৌকির মত ছোট একটি দড়ির খাটিয়া আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'বৈঠিয়ে।' পাশের কামরাটি থেকে অস্ফুট কাতরানির শব্দ কানে এল। ভারি অস্বস্তিই বোধ করলাম। এমন অসময়ে কেন আমাকে ডেকে নিয়ে এল গঙ্গাবাঈ। আর সময় কি ছিল না ?

গঙ্গাবাঈ পাশের ঘরে পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে একটু উচ্চকণ্ঠে বলল—'সবুর বেটি সবুর, এক্ষুনি আসছি। বাবুজি থোড়া বৈঠিয়ে আপ। দাওয়াই খাইয়ে আসি বেটিকে।'

পিতলের একটি প্রদীপ জ্বলছিল কোণের দিকে, পিলসুজটা মাটির। গঙ্গাবাঈ সেটিকে আরও একটু আমার সামনে টেনে নিয়ে এসে সলতেটা উস্‌কে দিল। তারপর চলে গেল পাশের ঘরে।

দীপের আলোয় দেখলাম, টুকটাক আসবাবপত্র নিতান্ত কম নয় ঘরের মধ্যে। কিন্তু সবই বেশ পরিপাটি করে গুছানো। গোটা তুই কাঠের বাক্স, হাঁড়িকুঁড়ি, জলের ঘড়া, কাঁসার বাসন, গোটা কয়েক পাথরের বাটি গুছিয়ে রাখা হয়েছে। একদিকে মাত্নর গোটানো রয়েছে একটি। বোধ হয় গঙ্গাবাঈর বিছানা। এককোণে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একজোড়া বাঁয়া তবলাও চোখে পড়ল। সম্ভবতঃ গঙ্গাবাঈ-এর ছেলের শখের জিনিস। আসবাবের এত ভিড় সত্ত্বেও ঘরখানির পরিচ্ছন্ন শুচি-স্নিগ্ধ আবহাওয়াটুকু নষ্ট হয়নি। দেখে ভারি ভালো লাগল।

খানিক বাদেই গঙ্গাবাঈ ফিরে এলো। পাতায় মুড়ে কি যেন নিয়ে এসেছে হাতে ক'রে। পিঙ্গলবর্ণের ছোট্ট একটি পাথরের বাটিতে করে গঙ্গাবাঈ আমার সামনে নিয়ে এল। তুটো প্যাঁড়া। বললাম—'ছিঃ, এসব কি শুরু করেছ! এই কি তোমার ভদ্রতা করবার সময় ?'

গঙ্গাবাঈ অপ্রতিভভাবে একটু হাসল—'মেহেরবানি ক'রে গরীবের ঘরে যখন এলেনই বাবুজি একটু মিষ্টি মুখে দিতে দোষ কি।'

একটু রূঢ় স্বরেই বললাম—'না, না ভারি খারাপ লাগছে আমার এসব। বাড়িতে তোমার অসুখবিসুখ আর তুমি কিনা—'

গঙ্গাবাঈ বলল—'অসুখ-বিসুখতো বেটির লেগেই আছে নয়াবাবু। মনে সুখ না থাকলে কি দেহ সারে। রাগ করবেন না বাবুজী, নিন একটু মিষ্টি, না হলে ভারি দুঃখ পাবো।'

অগত্যা অনুরোধটা রাখতেই হলো। ঘড়া থেকে গ্লাসে করে জল গড়িয়ে এনে আমার সামনে রাখলো গঙ্গাবাঈ। তারপর বলল—আপনাকে যত দেখি, আমার পেটের দুশমনটার কথা ভাবি বাবুজি। বছর কয়েক আগে বেণীও তো আপনার মত ঠাণ্ডা আর শান্ত ছিল। ও যে এমন ডাকু আর বদমাশ হয়ে দাঁড়াবে তা' কি কোনদিন ভেবেছি?'

চুপ করে রইলাম। গঙ্গাবাঈও একটু থামল, তারপর হঠাৎ বলল—'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো বাবুজি।'

বললাম—'মনে করবার কি আছে, বলো?'

গঙ্গাবাঈ বলল—'ঘরে ডেকে এনে একথা বলতে আমার ভারি সরম লাগছে। কিন্তু না বললেও জো নেই। পরের মেয়েটিকে পথ্য দিতে পারছি না বাবুজি। নিজের কাছে যা ছিল সব সেই দুশমন কেড়ে নিয়েছে। বহুত ধার রয়েছে বড়বাবুর আর ছোটবাবুর কাছে, ফের চাইবার মুখ নেই।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম—'কতো হলে এখন চলবে? টাকা পাঁচেকের বেশী তো আমার কাছে হবে না।'

গঙ্গাবাঈ বলল—'তাতেই হবে বাবুজী। মাইনের টাকা পেয়েই আপনাকে আমি দিয়ে দেব।'

পাঁচটাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বললাম—'আচ্ছা সে জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তোমার সুবিধা মতো দিয়ো।'

গঙ্গাবাঈ দোর পর্যন্ত এলো পিছনে পিছনে—'কিছু মনে করলেন না তো বাবুজী?'

বললাম—'না, না, ঘরে যাও তুমি।'

খানিকটা পথ এগিয়েছি পেছন থেকে একটা কর্কশ শব্দে চমকে উঠলাম—'হেই বাবুজী, খাড়া হো যাইয়ে।' ফিরে তাকিয়ে দেখি বেণী। এর আগেও ব্যাঙ্কে দু' একবার দেখেছি। চব্বিশ পঁচিশ বছরের জোয়ান। বেশ বলিষ্ঠ দেহ। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ঠোঁটের ওপর পুরু একজোড়া গোফ। কাঁধ পর্যন্ত চুলের গোছা পড়েছে। চোখ দুটি লাল। দৃশ্যে আর গন্ধে মনে হলো বিশেষ ভাবেই অপ্রকৃতিস্থ আছে। বেণী হঠাৎ সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'কুছ দিজিয়ে।'

বললাম—'তার মানে?'

বেণী বাঁকা চোখে গূঢ় ভঙ্গিতে একটু হাসল, তারপর স্বকীয় মাতৃভাষায় বলল—'আমি আড়াল থেকে সব দেখেছি। ও বেটিকে দিলেন আর আমায় দিলেন না? হাজার হোক জরু আমার নিজেরই।'

হিন্দিটা দুর্বোধ্য লাগলেও ইঙ্গিতটা অবোধ্য রইলো না। বলতে বাধা নেই সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল। লোকটা যে দুশ্চরিত্র তা শুনেছিলাম, কিন্তু এতখানি ভিলেনিস টাইপের তা' ধারণা করিনি। বেণীর শক্তি আমার চেয়ে অন্তত দু'গুণ তিনগুণ বেশী হবে। তারপর এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও না করতে পারে এমন কিছু নেই। তবু মনের মধ্যে সাহস আনবার চেষ্টা করে যথাসাধ্য জোরে ধমক দিয়ে উঠলাম—'কি বলছ তুমি? তোমার স্ত্রীর বুখার হয়েছে। তার ওষুধ-পত্র

কেনবার জন্য পাঁচ টাকা ধার নিয়েছে তোমার মা। তোমাকে কেন টাকা দিতে যাব। সর; পথ ছাড়ো।'

বেণী হেসে উঠলো—'চালাকি পেয়েছ বাবুজী? টাকা না নিয়ে পথ ছাড়বো এমনই বোকা ভেবেছ বুঝি আমাকে?'

ভারি বিপন্ন বোধ করলাম, খানিকটা দূরে জনকয়েক লোক যাচ্ছিল, তাদের লক্ষ্য করে প্রায় আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলাম—'পুলিশ, পুলিশ!'

বিস্মিত হয়ে তারা ফিরে দাঁড়াতেই বেণী সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল—'বহুত আচ্ছা। আমার পাওনা আর একদিন উশুল করবো।' ততক্ষণে লোকগুলি অনেকটা কাছে এসে গেছে। দেখে আশ্বস্ত হলাম, তাদের মধ্যে আমাদের এসিস্ট্যাণ্ট ক্যাশিয়ার তেওয়ারীজীও আছেন। পরিষ্কার বাংলা শিখেছেন তেওয়ারীজী। অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্যাপার কি? অমন করে চেঁচাচ্ছিলেন কেন, অঞ্জনবাবু? হয়েছে কি?'

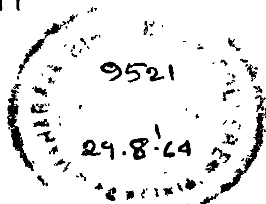
এতক্ষণে নিজের ভীরুতায় লজ্জিত হবার সময় পেলাম। বললাম—'বেণীকে চেনেন তো? আমাদের ওই গঙ্গাবাঈ-এর ছেলে?'

তেওয়ারী বললেন—'হাঁ, হাঁ, তাই কি?'

সংক্ষেপে বললাম—'মাতলামী শুরু করেছিলো সামনে এসে।'

তেওয়ারী আমার মুখের দিকে চেয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন—'ও তাই বলুন। কিন্তু মাতাল পুরুষকে দেখে আপনার তো ভয় পাবার কথা নয় অঞ্জনবাবু। মাতাল কোন মেয়ে দেখলেও না হয় কথা ছিল।'

ভারি রসিক মানুষ তেওয়ারীজী। ইতিপূর্বে তার এক-আধটু পরিচয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর এখনকার এই রসিকতার প্রয়োগে ঠিক তেমন রসস্থ বোধ করতে পারলাম না।



তেওয়ারীজী বললেন—‘চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি খানিকটা।’

বললাম—‘না, না, তার দরকার হবে না।’

তেওয়ারীজী বললেন—‘রাত করে চিনে যেতে পারবেন তো, না পথ হারিয়ে ফেলবেন।’

বললাম—‘না, অতখানি হতাশ হবার মত আপনার কারণ নেই।’

তিনি হেসে বললেন—‘না থাকলেই ভালো।’

বাসায় ফিরে আসতে বাদল উল্লাসে প্রায় চিৎকার ক’রে উঠলো—‘এই যে, এই যে পাওয়া গেছে অঞ্জনদা’কে।’

বললাম, ‘তার মানে ?’

বাদল বলল—‘তার মানে আমরা ভেবেছিলাম আপনাকে বুঝি হারালাম। এতো রাত্রেও যখন ফিরছেন না তখন আপনি আর নেই।’

বললাম—‘কিন্তু আমার রুটি তরকারি আছে তো ?’

বাদল হেসে বলল—‘আছে, আছে। গঙ্গাবাঈ অন লিভ। আমি আর কৃত্তিবাস মিলে কি চমৎকার খানা বানিয়েছি, দেখুন এসে খেয়ে।’

পরের দিন সকালে কাজে এলো গঙ্গাবাঈ। ভাবলাম কাল রাত্রে তার ছেলের ব্যবহারটা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিই তাকে! কিন্তু গঙ্গাবাঈ-এর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন মায়া হলো। চোখে মুখে রাত্রি-জাগরনের ক্লান্তি। দিনের তো কেবল শুরু, এরই মধ্যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়লে কি করে চলবে গঙ্গাবাঈর।

জিজ্ঞাসা করলাম—‘বৌ ভালো আছে তো ?’

গঙ্গাবাঈ বলল—‘হ্যাঁ, নয়াবাবু। বৌ একটু ভালোই আছে কিন্তু—’

কথাটা শেষ না করে হঠাৎ থেমে গেলো গঙ্গাবাঈ। আমিও আর কোন কথা বললাম না।

বঁটি পেতে গঙ্গাবাঈ তরকারি কুটতে বসলো। আমিও চলে যাচ্ছিলাম, গঙ্গাবাঈ বলল—'কিন্তু ভালো থাকা আমার কপালে নেই নয়াবাবু!'

আমি চুপ করে রইলাম। কাল রাত্রে বাসায় ফিরে বেণী যে আরও কদর্য রকমের মাতলামি করেছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই কোন।

গঙ্গাবাঈ বলল—'বেটা নয়তো, দুশমন! ওর জন্য কারো কাছে আমার আর মান সম্মান রইল না বাবুজী। ছেলের হয়ে আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি বাবুজী।'

তা' হলে বেণী বাসায় গিয়েও ওই সব কুৎসিত কথাবার্তা বলছে। যে কথা বলতে আমি সংকোচ বোধ করছিলাম গঙ্গাবাঈর তা জানতে বাকি নেই।

বললাম—'না না, তুমি কেন মাপ চাইতে যাবে। বেণী তখন সুস্থ অবস্থায় ছিলো না। ওসব কথা তো ও নিজে বলেনি, মদে বলিয়েছে।'

গঙ্গাবাঈ একটু যেন আশ্বস্ত হয়ে বলল—'সাচ্চা কথা বলেছেন নয়াবাবু। মদই ওর সর্বনাশ করল। মদ যখন খায় না তখন বেশ থাকে। নেশা যখন কাটবে ওই ছুটে আসবে আপনার কাছে মাপ চাইতে।'

সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আমার সন্দেহ আছে। তবু গঙ্গাবাঈর কথার কোন প্রতিবাদ করলাম না। দুশ্চরিত্র ছেলের সম্বন্ধে এখনো তার মনে যে আশা আর আস্থাটুকু আছে তা' ভেঙ্গে দিয়ে লাভ কি। কিন্তু কাল নির্জন গলিতে বেণীকে দেখে এবং তার কথাবার্তা শুনে যে রকম

ভীতি-বিহ্বল অবস্থা হয়েছিল আজ সে কথা ভেবে নিজেরই হাসি পেল। সত্যিই একটা পথের মাতালকে দেখে অতখানি ভয় ব্যাকুল হওয়ার দরকার ছিল না।

তেল মেখে চান করতে যাচ্ছি দেখা হলো বাদলের সঙ্গে, মুচকি হেসে বলল—'অঞ্জনদা, ওপর ওপর আপনাকে যতখানি ভালো মানুষ ব'লে মনে হয় ভেতরে ভেতরে আপনি কিন্তু তা' নন।'

বললাম—'হঠাৎ তোমার এরকম ধারণা হবার কারণ ?'

বাদল বলল—'রাধুনীটিকে তো রীতিমত বশে এনেছেন। ম্যানেজার একাউণ্টেণ্টের চেয়েও নেকনজরটা ইদানীং যেন আপনার ওপরেই তার কিছু বেশি বেশি মনে হচ্ছে। কেবল আমিই কিছু ক'রে উঠতে পারলাম না। আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না গঙ্গাবাঈ।'

হেসে আশ্বাসের সুরে বললাম—আচ্ছা, আচ্ছা। অত আফসোসের কারণ নেই। আমি বলে দেব গঙ্গাবাঈকে যেন এখানকার ছোটবাবুকেও বড়বাবুর মত একটু বেশি খাতির যত্ন করে। তরকারির পরিমাণটা কিছু বেশি দেয়। মাঝে মাঝে মাছের বড় টুকরোটি, কি বলো ?'

বাদল বললো—'বাস্ বাস্, তাহলেই চলবে। এর চেয়ে বেশি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই।'

বাদলের ওপর গঙ্গাবাঈর অপ্রসন্নতা আমারও চোখে পড়েছে। সকলের চেয়ে বয়সে ছোট বলে গঙ্গাবাঈর স্নেহ তার ওপরই পড়বার কথা ছিল। কিন্তু বাচাল বাদলের অতিপ্রগল্ভতা গঙ্গাবাঈর ভালো লাগেনি। একটু বেশি আদর যত্ন মাছ তরকারির লোভে বাদল নাকি একদিন গঙ্গাবাঈর খপসুরৎ চেহারারও প্রশংসা করেছিল। গঙ্গাবাঈ শাসিয়ে রেখেছে ফের যদি ও ধরনের কথা উচ্চারণ করে বাদল তা'হলে তার কান ধরে টেনে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাবে।

নাওয়া-খাওয়ার পাট সেরে অফিসে এলাম। নীলকান্তবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—'আজো আপনি পাঁচ মিনিট লেট অঞ্জনবাবু। দোতলায় বাসা, একতলায় অফিস, মাঝখানেতো গোটা কয়েক সিঁড়ি। তাতেও যদি রোজ পাঁচ-সাত মিনিট লেট হ'ন্ আমার তো কিছু আর বলবার নেই।'

নিঃশব্দে হাজিরা বইতে সই করে নিজের জায়গায় বসলাম। কোন কৈফিয়ত দিতে গেলে নীলকান্তবাবু আরো চটে উঠবেন। কিন্তু বোবা সেজেও রেহাই মিলল না। নীলকান্তবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—'কথা বলছেন না যে ?'

গম্ভীর ভাবে বললাম—'আমার কিছু বলবার নেই।'

সহকর্মীরা সবাই সকৌতুকে একবার আমার দিকে তাকাল। প্রমথবাবু আর নিরুপমবাবু তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর ঝুকে পড়ে হাসি গোপন করলেন। কিন্তু বাদলের হাসির শব্দ অশ্রুত রইল না। টেবিলের নিচে মুখ লুকিয়ে রাখল সে, কিন্তু হাসির বেগে তার সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হতে লাগল। সেভিংস লেজার রাখে মণিময়। ব্যাঙ্কের বাড়িতে সে থাকে না। খামারিয়া থেকে সাইকেলে করে রোজ যাতায়াত করে। বাদলের সঙ্গে তার খুব খাতির। কিন্তু বাদলকে অত বেশি সময় ধরে হাসতে দেখে সে পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল—'আঃ, হচ্ছে কি ? থামো।'

নীলকান্তবাবু একবার ক্রুদ্ধ মুখে সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর আমার দিকে এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন—'আচ্ছা, শুনে রাখলাম। কিন্তু, এর পর এক ঘণ্টা ধরে কথা বললে আপনার বক্তব্য শেষ হবে না তা আমি জানি।' তারপর বাদলের দিকে চেয়ে রূঢ় ধমকের সুরে বললেন—'বাদলবাবু, আপনি যদি ভদ্রলোকের মত চেয়ারে বসে না থাকতে পারেন, বাইরে চলে যান।'

নীলকান্তবাবু অন্য সবাইর মত বাদলকে নাম ধরে ডাকেন না, বাদলবাবুই বলেন। তাঁর ধারণা বাবুত্ব লোপ করে সবাই বাদলের নামের সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গতা আর প্রশ্রয়ের সুর মিশিয়ে দিয়েছে। ফলে তার যথার্থ যা বয়েস তার চেয়েও নিজেকে সে অল্পবয়স্ক মনে করতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানও তার হ্রাস পেয়েছে।

বাদল মুখ লাল ক'রে কি জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু মণিময় তার গা টিপে দিয়ে বলল—'চুপ কর, এখন নয়।'

চেক ভাঙ্গাবার জন্য বাদলের কাউণ্টারে লোক এসে দাঁড়াল। বাদল যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করতে করতে বলল—'আচ্ছা, এর জবাব আপনি পরে পাবেন।'

নীলকান্তবাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কিন্তু কোন কথা বললেন না। কেন না ততক্ষণ বাইরের লোকজন আসতে শুরু করেছে। ভিড় হয়েছে আমার টেবিলের সামনেও। ড্রাফ্‌ট চাই। হাজার হাজার টাকা জমা দিচ্ছেন তেওয়ারী, আমি তার রসিদ দেখে দ্রুতবেগে ড্রাফ্‌ট কেটে দিচ্ছি। স্থানীয় হিন্দুস্থানী আর মারাঠি ভদ্রলোক। চেহারা আর বেশবাস দেখে মনে হয় না যে অতটাকা নাড়াচাড়া করেন। কোঁচার খুট খুলে নোটের তাড়া গুনে গুনে দিচ্ছেন তেওয়ারীকে। তারপর আমার কাছে এলেই জিজ্ঞেস করি—পানেওয়ালার নাম কি, ভেজনেওয়ালা কে, কোন্ শহর? লাহোর না লখ্‌নৌ, দিল্লী না এলাহাবাদ?

ম্যানেজারের ঘরের ভেতর থেকে ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। কমলাক্ষবাবু তখনো এসে পৌঁছান নি। বিরক্ত হয়ে নীলকান্তবাবুই ফোন ধরলেন, তারপর ফিরে এসে আরো বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'যান আপনার ফোন এসেছে। যত সব আলাপ

আলোচনা তো কাজের সময়ই কিনা আপনাদের। যান শুনে আসুন। ডাক্তারবাবু ডাকছেন আপনাকে।'

ড্রাফ্‌ট লেখা রেখে ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ফোন ধরলাম,—'কে ডাক্তারবাবু?'

—'হ্যাঁ, আপনি কে কথা বলছেন, ড্রাফ্‌টবাবু নাকি?'

স্মরজিৎবাবু এর আগে ব্যাঙ্কে এসে দু' একদিন আমাকে ড্রাফ্‌ট লিখতে দেখেছেন। কিন্তু হিন্দুস্থানী চাকর শ্রেণীর লোকদের মত তাঁর মুখেও এই সম্বোধন শুনে একটু বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। তা ছাড়া তাঁর বলায় কিছু পরিহাসের সুরও ছিল। ক্ষুণ্ণ হয়ে জবাব দিলাম—'হ্যাঁ, আমি অঞ্জন। আপনার ড্রাফ্‌ট কাটা দরকার?'

স্মরজিৎবাবুর হাসির শব্দ শোনা গেল—'না না, কিন্তু আপনারও নিশ্চয় ওষুধ আর ট্রিটমেণ্টের দরকার নেই। তবুতো ডাক্তারবাবুর খোঁজ করছিলেন। দেখুন, পেশাটি ডাক্তারী বলে এমন কি মহাপাপ করেছি যে বিনা প্রয়োজনেও চব্বিশঘণ্টা ডাক্তারবাবু শুনতে হবে।'

হেসে বললাম—'নামটি যে আপনার এত অপছন্দ, জানতাম না। কথাটা আমার তো বেশ মিষ্টি লাগে শুনতে।'

স্মরজিৎবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'মিষ্টি! নিজে যদি ডাক্তার হ'তেন তাহ'লে বুঝতেন। ড্রাফ্‌টবাবু বলবার মতই চটতেন। বিপন্ন রোগীর মুখে মাঝে মাঝে ডাকটি মন্দ লাগে না, কিন্তু ভোগীর মুখে ভারি উৎকট শোনায়। তাছাড়া আমি তো কেবল ডাক্তারীই করি না।'

এতক্ষণে স্মরজিৎবাবুর অভিমানটুকু বুঝতে পারলাম। বললাম—'তা জানি স্মরজিৎবাবু। কিন্তু চিত্রকরবাবুও কি খুব সুখকর শোনাবে?'

স্মরজিৎবাবু একটু চুপ করে রইলেন। মনে হ'ল তিনি একটু যেন ক্ষুণ্ণ হ'লেন। কিন্তু পরক্ষণেই ফোনে আবার তাঁর কণ্ঠ ভেসে এলো—

'না, তার চেয়ে আমার নিজের নাম অনেক শ্রুতিমধুর অঞ্জনবাবু। কিন্তু এসব আলোচনা সাক্ষাৎ মত হবে। আপনি আসুন।'

—'আসব। কিন্তু আপনার সেই রোগী আজ ভালো আছে তো ?'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু সে কথা আমার মুখ থেকে শুনলে তো আপনার বিশ্বাস হবে না। একটু ধরে রাখুন, শ্রীমুখ থেকেই শোনাচ্ছি।'

একটু পরেই মিসেস মুখার্জির গলা শোনা গেল—'অঞ্জনবাবু, কাল সত্যিই আমার ভারি অপরাধ হয়ে গেছে।'

বললাম—'না না, সে কি কথা !'

—'ভারি লজ্জাবোধ করছি, যদি না আসেন ভাবব রাগ করে এলেন না।'

—বললাম—'না না, কি যে বলেন। রাগ করবার কি কারণ থাকতে পারে।'

—'শুনে খুব খুশি হলাম। তা' হ'লে আজ সন্ধ্যের পর আসছেন ?

—'আচ্ছা।'

—'আর শুনুন, কমলাক্ষবাবু কি আছেন ওখানে ? তা'হলে ফোনটি একবার দয়া ক'রে তাঁকে দিনতো একটু।'

বললাম,—'তিনি এখনো এসে পৌঁছান নি অফিসে। ওপরে আছেন, ডেকে দেব তাঁকে ?'

—'না, না, থাক। আপনি আসবেন কিন্তু অবশ্যই।'

ফিরে এসে দেখলাম নীলকান্তবাবু নিজেই ড্রাফ্‌ট লিখতে শুরু করেছেন। আমাকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—'হলো ? আজ যে ফিরে এসে কাজকর্ম করতে পারবেন এমন আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বললাম—'আপনি বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন, নীলকান্তবাবু।'

—'কি বললেন, বাড়াবাড়ি!'

বললাম—'তা'ছাড়া আর কি। কারো ফোন এলে সে ফোন করতে যেতে পারবে না?'

নীলকান্তবাবু বললেন—'যেতে পারবে না কেন? কিন্তু ফিরে আসবার কথাও তাঁকে মনে রাখতে হবে। অফিসের ফোন অতক্ষণ ধ'রে আটকে রাখলে কাজকর্মের যে ক্ষতি হয় একথাও স্মরণ থাকা দরকার।'

জুতোর মশমশ শব্দে কমলাক্ষবাবু ঘরে ঢুকলেন। বললেন—'ব্যাপার কি নীলকান্তবাবু। এত বাগবিতণ্ডা কিসের?'

নীলকান্তবাবু হঠাৎ সুর বদলে বললেন—'কিছু না। নিতান্তই ডিপার্টমেণ্টাল ব্যাপার।'

কমলাক্ষবাবু একটু মুচকি হেসে নিজের কামরার মধ্যে চলে গেলেন।

পারতপক্ষে ম্যানেজারের পরামর্শ নিতে যান নীলকান্তবাবু। অত্যন্ত বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হ'লেও স্টাফের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে গিয়ে কোন অভিযোগ জানান না। যা' কিছু ব্যবস্থা করবার নিজেই করেন। কড়া কড়া দু'একটা কথা বলেন, ভয় দেখান হেড অফিসে রিপোর্ট করবেন বলে, কিন্তু কখনো গিয়ে ম্যানেজারের দ্বারস্থ হ'ন না। বাদল বলেছিল, আসলে ম্যানেজারবাবুকে ভয় করেন নীলকান্তবাবু। নিরুপমবাবুর ধারণা অন্যরকম। মুখে যাই বলুন, ভেতরে ভেতরে নীলকান্তবাবু নাকি ভারি ভালো মানুষ। সহজে কারো কোন ক্ষতি করতে চান না তিনি। বিল ডিপার্টমেণ্টের প্রমথবাবুও নীলকান্তবাবুর সততায় বিশ্বাস করেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁর স্বতন্ত্র একটু আবিষ্কার

আছে। ম্যানেজার আর একাউন্টেন্ট একসময় সহপাঠী ছিলেন ; ডিগ্রিতে একটু খাটো বলে ম্যানেজারী পদটা এখনো আয়ত্তে আসেনি নীলকান্তবাবুর। আর মাত্র বছর খানেক অফিসে ঢুকেই কমলাক্ষ-বাবু ব্রাঞ্চম্যানেজার পদ লাভ করেছেন। কর্তৃপক্ষের এই পক্ষপাতিত্বে নীলকান্তবাবু খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষোভের কারণ বাড়িয়ে কর্তৃপক্ষ তাকেই আবার ফের কমলাক্ষবাবুর অধীনে এ্যাকাউন্টেন্ট করে পাঠিয়েছেন। অথচ নীলকান্তবাবুর ধারণা ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজকর্ম তিনি কমলাক্ষবাবুর চেয়ে অনেক বেশি ভালো জানেন। প্রাক্তন সহপাঠীর অধীনে কাজ করাই যথেষ্ট মর্যাদাহানিকর। তারপর ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাঁর কাছে আবেদন নিবেদন করতে যাওয়া নিশ্চয়ই নীলকান্তবাবুর মর্যাদাবোধে বাধে। নীলকান্তবাবু কথায় কথায় নাকি একদিন প্রমথবাবুর কাছে বলেছেন যে, কমপ্লেন যদি করতেই হয় তিনি খোদ হেড-অফিসেই করবেন, এখানে করে মুখ হাসাবেন না।

নীলকান্তবাবুর আত্মসম্ভ্রম ভারি মুগ্ধ করেছে প্রমথবাবুকে। তিনি বলেন, সময় সময় রূঢ় ব্যবহার করলেও অনেক গুণ আছে মানুষটির মধ্যে। ম্যানেজারের মত অমন ঢিলেঢালা স্বভাব হ'লে অফিস ম্যানেজ করতে পারতেন না। কমলাক্ষবাবু তো নামেই ম্যানেজার, আসলে অফিসতো চালান নীলকান্তবাবু।

প্রশংসনীয় গুণ যে নীলকান্তবাবুর আছে তা' আমিও লক্ষ্য করেছি। কাজ-কর্ম কটা জানেন তা' বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু নিষ্ঠা আর একাগ্রতা আছে তাঁর কাজে। অন্য কোন দিকে খেয়াল নাই। ঝোঁক নেই অবসর যাপনের। তাঁর সমস্ত চিন্তা আর চেষ্টা কেবল ব্যাঙ্কের মধ্যেই আবদ্ধ। চরিত্রেও এক কঠিন নিয়মানুবর্তিতা আছে। রুটিন-বাঁধা ছক-কাটা জীবনই তাঁর পছন্দ। চাকরিতে উন্নতি করতে হলে

তাঁর মতে এছাড়া আর পথ নেই। জীবনের উন্নতিরও ঐ একই রাস্তা। অবশ্য নীলকান্তবাবুর সম্বন্ধে আমার এই গুণগ্রাহিতার পরিচয় এখন দিতে পারছি, তখন পারতাম না। তখন একটা বিদ্বেষ সব সময়ই মনে জাগ্রত। কেননা স্বভাবের মধ্যে আমাদের দু'জনের কোনও ঐক্য ছিল না। তা ছাড়া আমার স্বভাবে খুঁত ধরবার প্রবৃত্তিটা নীলকান্তবাবুর বড় বেশি মাত্রায় ছিল।

সারাদিন খুঁটিনাটি নিয়ে খিটমিট করলেন নীলকান্তবাবু। অনেকবার ভাবলাম নিজেই ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করি। কিন্তু স্কুলের ছাত্রদের মত কথায় কথায় গিয়ে নালিশ করাবর পদ্ধতিটাও খুব সম্মানজনক মনে হ'লো না।

ছুটির পর ঘরে এসে হাঁফ ছাড়লাম। মনে পড়ল স্মরজিৎবাবুর কথা। মনে হ'ল আলাপ আলোচনায় সময়টা মন্দ কাটবে না বোধ হয়। সন্ধ্যার দিকে বেশবাসটা অনেকটা ভদ্রগোছের ক'রে নেবার চেষ্টা করছি, লক্ষ্য ক'রে বাদল বলল—'ব্যাপার কি অঞ্জনদা। এত ঘটা কিসের! হঠাৎ ম্যানেজারের হাওয়া গায়ে লাগল নাকি? কোথায় যাচ্ছেন বলুন। আজ কিন্তু আমি আর সঙ্গ ছাড়ছি না।'

বললাম—'ডাক্তারবাবু ফোন করেছিলেন। তাঁর ছবি দেখতে যাচ্ছি। তুমি যাবে কোথায়?'

বাদল নাছোড়বান্দার মত বলল—'কেন, ছবি দেখতে। আমার বুঝি আর চোখ নেই সঙ্গে? আমি বুঝি আর দেখতে জানি না। শুনুন, আমিও দেখেছি। কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে দু'দিন গিয়েছিলাম।'—শেষের কথাগুলি বাদল আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল।

ধমকের সুরে বললাম—'আঃ থামো! বয়সের তুলনায় বড় বেশি পেকে গেছ বাদল।'

বাদল রীতিমত একজন বয়স্ক প্রবীণ পুরুষের ভঙ্গিতে জবাব দিল

—'সাধে কি আর পেকেছি অঞ্জনদা, বাধ্য হয়ে পাকতে হয়েছে। না পেকে জো ছিল না। আচ্ছা সে সব কথা ক্রমে ক্রমে বলব আপনাকে। এবার চলুন বেরুনো যাক্।'

বাইরে এসে দেখলাম বেশ বেলা আছে এখনো। ঘরের ভিতর একটু অন্ধকার অন্ধকার মনে হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার এখনো অনেক দেরি আছে। ঠিক হ'লো গোলবাড়ির মাঠে কয়েক পাক ঘুরে খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে স্মরজিৎবাবুর ওখানে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া যাবে।

গিয়ে দেখলাম গোলবাড়ির মধ্যে ততক্ষণে ভ্রমণার্থীদের রীতিমত ভিড় জমে গেছে। দলে দলে নানা বয়সী স্ত্রী-পুরুষ সান্ধ্যভ্রমণে বের হয়েছে। বাঙালী পুরুষদের সংখ্যা নিতান্তই কম। বাদল আমার আগে আগে চলছিল। হঠাৎ দশ এগারো বছরের একটি ছেলে এসে আমাকে অতিক্রম করে বাদলের হাত চেপে ধরল।—'বাদলদা!' বাদল চমকে উঠে পেছনের দিকে তাকাতেই তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল—'ও, ভজন, তাই বল। বাঘা কুকুরের মত যেভাবে থাবা দিয়ে ধরেছিলি, আমি ভাবলুম কে না কে, আর অতবড় নখ রেখেছিস কেন?'

ভজন বললে—'তাই বলে আপনি আমাকে কু. বলবেন নাকি? বাঃ রে। দাঁড়ান দিদিকে গিয়ে যদি আজ না বলি তো কি বলছি।'

এরই মধ্যে এক দঙ্গল ছেলেপুলে নিয়ে প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন।—'বাদল যে, কি হয়েছে তোমার। অনেক দিন যাওনি যে আমাদের বাসায়। ইনি কে?'

বাদল আমার পরিচয় দিয়ে বলল—'ব্যাঙ্কে কাজ করেন আমাদের সঙ্গে। অল্পদিন হ'ল হেড অফিস থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। আর,—ইনি আমার মেসোমশাই শ্রীযুত ভবেশ চন্দ্র গুহ, মিলিটারী একাউণ্টসে অফিসার হয়ে আছেন এখানে।'

নমস্কার বিনিময়ের পর ভবেশবাবু বললেন—'ভারি খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। পথে বেরুলেই আজকাল নিত্য নতুন বাঙালী মুখ দেখা যায় শহরে। যুদ্ধের দৌলতে বলতে গেলে বাঙালীরই শহর হয়ে উঠেছে এটা। দু'তিন পুরুষ ধরে এখানে আছেন এমন একজন বাঙালীর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন বছর পাঁচেক আগেও একজন বাঙালীর মুখ দেখার জন্য রীতিমত উৎসুক হয়ে থাকতে হ'তো। নতুন কোন বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র তিনি নাকি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন।'

হেসে বললুম, 'আমরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।'

তিনিও হাসলেন, বোধ হয় তাই। পরিচয় হওয়া মাত্র আমি তাঁর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাই নি। কিন্তু তা বলে আমাদেরও যে তাঁকেই ফলো করতে হবে এমন কোন মানে নেই: 'আপনি চলুন আমাদের ওখানে! কি বলো বাদল, সঙ্গে করে নাও ওঁকে। ভারি খুশী হবেন তোমার মাসিমা।'

বাদলও বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো,—'চলুন অঞ্জনদা, সেই ভালো।' একটু ইতস্তত করে বললুম, 'কিন্তু আমার যে অন্য এক জায়গায় এপয়েন্টমেণ্ট আছে বাদল। ডাক্তারবাবুকে যে কথা দিয়েছি।'

বাদল বলল, 'সে না হয় অন্য আর একদিন যাবেন, আসুন আসুন, এখানেও খুব লোকসান হবে না আপনার। ছবি না দেখাতে পারলেও গান শোনাতে পারব নিশ্চয়ই। সত্যি ভারি চমৎকার গায় জ্যোতি, তেমন যদি সুযোগ সুবিধা পেত—'

ভবেশবাবু বললেন, 'আর সুযোগ সুবিধা, রোগের সেবা করবে, না সংসারের কাজকর্ম দেখবে। ভাই বোনগুলিও তো কম দুরন্ত

হয়নি, একেকজন একেকটি রত্ন। সব ঝামেলা ঝক্কি তো জ্যোতির উপর দিয়েই যায় কিনা, কেউ আমল পায় না মার কাছে। সে ভারি শক্ত ঠাঁই।'

বাদল বলল, 'তা হলে কি বলেন অঞ্জনদা, চলুন যাই, বেড়িয়ে আসি মেসোমশাইর ওখান থেকে। ডাক্তারবাবুর ছবি না হয় আর একদিন দেখবেন।'

ভবেশবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন্ ডাক্তারবাবুর কথা বলছেন, স্মরজিৎবাবু নাকি?' বললুম, 'হাঁ, তাঁর ওখানেই আজ যাবার কথা ছিল।'

ভবেশবাবু বললেন, 'তিনি ত' আজো এসেছিলেন আমাদের এখানে। এখানে আসা অবধি আমার স্ত্রীকে উনিই দেখছেন! বেশ চমৎকার ভদ্রলোক, ডাক্তার হিসাবেও ভালো, কিন্তু ঐ যা বললেন, ছবির বাতিকই সব মাটি করেছে। ছবি নিয়ে একবার বসলে, কি ছবির বিষয়ে কোন আলোচনা উঠলে ওঁকে আর টেনে তোলা যায় না। ভাগ্যিস ওঁর স্ত্রী সবসময় দৃষ্টি রাখেন ওঁর উপর। না হলে কত রোগীর যে জীবন নষ্ট হতো তার ঠিক নেই।'

এর আগের দিন মিসেস মুখার্জির ব্যবহারের খানিকটা অর্থ এবার বুঝতে পারলাম। ভবেশবাবু বলতে লাগলেন, 'শুনেছি ওঁর বাবা বিশ্বজিৎবাবুর চমৎকার পসার ছিল এ শহরে। কিন্তু স্মরজিৎ-বাবু নিজের দোষে নিজের খামখেয়ালে সব নষ্ট করতে বসেছেন। মশাই, চাকরির চেয়েও বেশী দায়িত্ব এসব কাজে, হাজার-জনের মন জুগিয়ে চলতে হয়।'

বললাম, 'তা'ছাড়া দায়িত্বও এসব কাজে বেশি।'

ভবেশবাবু বললেন, 'বেশিই তো। এতো আর কাগজের ওপর কলম খুচিয়ে যাওয়া নয়, তুলিতে পোঁচ দেওয়া নয় পটে, মানুষের

জীবন-মরণ নিয়ে ডাক্তারের কাজ। তাতে হেলাফেলা করলে চলবে কেন! এখানে একটু অন্যমনস্ক হলে যে কত সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে তার কি ঠিক আছে। আরে বাদল, ছেলেপুলেগুলি গেল কোথায়?' ভবেশবাবু যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

আমাদের কথাবার্তা বলতে দেখে ভজনের দল ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বাদল সামনের দিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'ঐ যে ওদিকে ওরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যাই আমি একটু তাড়া দিয়ে নিয়ে আসি মেসোমশাই।'

ভবেশবাবু বললেন, 'হাঁ যাও বাবা, একটু ধমক টমক দিয়ে নিয়ে এসো। রাত আটটার আগে ওরা কিছুতে ঘরে ফিরতে চায় না। আমি আজ তাই নিজে সঙ্গে নিয়ে এসেছি!'

বাদল হেসে বলল, 'ভারি ভয় করে কিনা ওরা আপনাকে।' ভবেশবাবু বললেন, 'না, না, ভয় বরং ওদেরই করি আমি। তোমার মাসিমা বলেন আমি তেমন শাসন না করাতেই নাকি ওরা এমন বয়ে যাচ্ছে। আমি বলেছি, বেশ তো শাসন তোমরা কর। যা বাজার তাতে ভরণ-পোষণের ভাবনাতেই অস্থির। এরপর রাতদিন যে ছেলেপুলের পিছনে পুলিশের কাজ করে বেড়াব তা আমার দ্বারা চলবে না বাপু। বাপ হয়েছি বলে এমনই পাপ করেছি যে একদণ্ড চুপচাপ বসে থাকতে পারব না।'

এমন নিরীহ স্বভাবের বাঙালী গৃহকর্তা খুব বিরল নয় সংসারে। সমস্ত উৎসাহ আর সামর্থ্য ব্যয়িত হয় অফিসের কেরানীগিরিতে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সব ভার ন্যস্ত থাকে গৃহিণীর ওপর। দোর্দণ্ড প্রতাপে তিনি চালান তাঁর রাণীগিরি। ভবেশবাবুর মত ভদ্রলোক আরো অনেক দেখেছি। কিন্তু কথাবার্তার ধরণটির মধ্যে কেমন যেন আন্তরিকতার আমেজ আছে। এ জিনিস খুব সুলভ নয়।

বেশ শান্ত শিষ্ট সরল প্রকৃতির মানুষ। দশ পনরো মিনিটের মধ্যে নিজস্ব বহু পারিবারিক তথ্য উদ্ঘাটন করে দিলেন। নেপথ্যের হলেও বেশ লাগল এই পারিবারিক পরিবেশটুকু। ব্যাঙ্কের মেস ত' নয়, হাটবাজারের হট্টগোল। বাদলের ভাষায় মেসের মধ্যে মোষের দল চরে বেড়ায়। ভারি কাটখোট্টা আর নীরস মনে হয় মাঝে মাঝে দিন-রাত। ভবেশবাবুর স্বভাব-সারল্য, তাঁর স্ত্রীর পুত্রকন্যার ছিটে-ফোঁটা সংবাদ একটি মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের যেন একেবারে দোর-গোড়ায় এনে পৌঁছে দিল। জীর্ণ একখানা পাতলা পর্দা যেন হাওয়ায় দুলছে তার দোরের ওপর। তার আড়ালে নিতান্তই সব চেনা মানুষের আনাগোনা। ডাক্তারবাবুর ডাক পড়ে রইল। ভবেশবাবুর আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারলাম না।

ভবেশবাবু বললেন, 'তা'হলে চলুন আমরা একটু একটু এগোই। বাদল নিয়ে আসুক তার চেলাচামুণ্ডাদের।'

বললাম, 'ছেলেপুলে খুব ভালবাসে বাদল। ওদের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে।'

ভবেশবাবু বললেন, 'মিশবে না? ও নিজেই বা কি এমন একজন প্রাচীন প্রবীণ মানুষ। উনিশ কুড়ি বছর বয়স একটা ব... নাকি পুরুষ-ছেলের! আর ভদ্রলোকের ছেলে এই বয়সে এমন বিদেশ বিভুঁয়ে চাকরি করতে আসে শুনেছেন কোথায়ও?'

বললাম, 'তা' ঠিক, এবয়সে পড়াশুনা করাই ওর উচিত ছিল।' ভবেশবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'ছিলই তো, দাদাদের সঙ্গে রাগারাগি করে চাকরি নিয়ে চলে এসেছে। বলে, নিজের খরচা নিজেই চালাব। ভারি একগুঁয়ে স্বভাব। কারো কথা শুনবে না, ওর মাসিমা আরো না হলে অন্তত হাজার দিন বলেছেন বাদলকে এই বাসায় নিয়ে এসো, জায়গা বাসা তেমন নেই। রান্নাঘর ছাড়া ছোট ছোট মাত্র তিনখানেক ঘর!

আড়াইখানা বললেই হয়। যাচ্ছেনই তো, দেখবেন সব। তবু মিলেমিশে এক জায়গায় থাকা যেত। ছেলেপুলেগুলিরও পড়াশুনাটাও সকাল বিকেল বেশ একটু দেখিয়ে দিতে পারত। কিন্তু ও কি কথা শুনবার ছেলে মশাই ?'

বললাম, 'একটু একগুঁয়েমি ওর আছে।'

ভবেশবাবু আপত্তি করে, 'একটু বলছেন কি! তা'লে আপনি ওকে মোটেই চিনতে পারেন নি। একেবারে পুরোপুরি ষোল আনা এক-গুঁয়েমিতে ভরা। আমার ভায়রাটিও ছিলেন ঠিক ওই রকম। ঠিক একেবারে বাপের স্বভাব পেয়েছে।'

বললাম, 'কি রকম ভায়রা ছিলেন তিনি আপনার!'

ভবেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কি রকম মানে ? একেবারে আপন ভায়রা। বাদল আমার স্ত্রীর আপন মায়ের পেটের বোনের ছেলে। কিছু বুঝি বলেনি আপনাকে!'

ভবেশবাবুকে জানালাম, এ সম্বন্ধে বাদলের সঙ্গে আমার কোন আলোচনা হয় নি। তিনি আমার কথা তেমন লক্ষ্য করলেন না, নিজের কথারই জের ধরে বলতে লাগলেন, 'আমার স্ত্রীরা পাঁচ বোন। আমার স্ত্রী মেজো। বাদলের মা অনুপমা হলো সবচেয়ে ছোট। ভারি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে বেচারা। আমার বড় ভায়রাও মারা গেলেন বছরখানেক হলো। আমার স্ত্রী কি বলে জানেন,—আমার বোনদের যেরকম ভাগ্য দেখছি তা'তে তোমাকে রেখে যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি তত'ই ভালো। আমি বলি মরণকে তোমার আর সেধে ডেকে আনতে হবে না। সে একেবারে এসে গেছে। চেহারা যা' হয়েছে মশাই, চলুন যাচ্ছেনই তো, গিয়েই দেখবেন।'

দলবল নিয়ে বাদল এসে পড়ল। ভজন ছাড়াও ছোট ছোট আরো গুটিচারেক ছেলেমেয়ে রয়েছে সঙ্গে। সবচেয়ে ছোট মেয়েটির বয়েস

বোধহয় দু'হয়ে বেশি নয়। সাত-আট বছরের একটি বেণী-দোলানো মেয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। সব কয়টি ছেলেমেয়ের মুখের আদল প্রায় একই দেখতে। ভাইবোন বলে চিনতে দেরি হয় না। বোন-কোলে-করা মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'তোমরা ঠিক একেবারে কাছিমের মতো হাঁটছিলে বাবা। কতদূর থেকে তোমাদের এসে ধরলাম।'

ভবেশবাবু মধুর বাৎসল্যে হাসলেন, 'হ্যাঁ আমরা কাছিম, তোরা একেবারে খরগোস। তাই তো প্রাণপণে না দৌড়ে এসে ধরতে পারলি নে। দেখছেন কিরকম হাঁপাচ্ছে মেয়েটি।'

ভবেশবাবু হাত ধরে তাকে টেনে নিতে গেলেন, কিন্তু মেয়েটি তৎক্ষণাৎ সরে গেল। ধরা দিল না বাবার হাতে।

বাদল বলল, 'থাক থাক, আর তোর বাহাদুরি করতে হবে না সীতা। এইতো আর একটুর জন্য হোঁচট খাচ্ছিলি। নিন্তুকে নিয়ে যদি পড়ে যেতিস কি হতো?'

সীতা জবাব দিল, 'পড়িনি তো, পড়লেই না হয় বলতেন। মিছিমিছি গাল খাওয়াবার চেষ্টা করছেন কেন?'

ভবেশবাবু হাসিমুখে প্রতিবাদ করলেন, 'আমি কি তোদের খুব গালাগাল দিই নাকি সীতু?'

সীতা গাল বাঁকিয়ে বলল, 'তোমার কথা কে বলছে বাপু। তুমি নিজেই তো গালাগাল খেয়ে অস্থির। তুমি ছাড়া আর বুঝি বাড়িতে লোক নেই। বাদলদা মা আর দিদির কাছে নালিশ না জানিয়ে ছাড়বে নাকি ভেবেছ? ওঁকে যেন আমি চিনি না, তেমন সোজা মানুষই কিনা তিনি।'

ভবেশবাবু বললেন, 'তুমি নিজেও একটু বাঁকা-বাঁকা কিনা মা, তাই দুনিয়াটাই তোমার কাছে সে-রকম ঠেকছে।'

বাপের দার্শনিকতায় কান দেবার মত অবসর ছিল না সীতার। সে আমাদের পেছনে ফেলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। আরো দু'-একটি বায়ুসেবীর দলও আমাদের মত সকাল সকাল ফিরে চলেছে দেখলাম। দক্ষিণদিক থেকে চারুদর্শনা একটি মেয়ে সাইকেলে শোঁ করে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। খুব সাইকেল চড়বার শখ আছে এখানকার মেয়েদের। সীতা থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমায় একটা সাইকেল কিনে দেবেন বাদলদা ?'

বাদল সংক্ষেপে বলল, 'দেব।'

সীতা অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'হ্যাঁ দেবেন, না ছাই। আপনি কেবল দেবেন দেবেনই করেন! দেন না কিছুই। যত খাতির আপনার দিদির সঙ্গে।'

আরো দশ পনরো মিনিট হাঁটবার পর ভবেশবাবুর বাসার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। ভবেশবাবু আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে আপ্যায়নের সুরে বললেন, 'আসুন অঞ্জনবাবু, ভেতরে আসুন। অবশ্য যা চেহারা তাতে বাইরে থেকে কাউকে ডেকে এনে দেখাতে লজ্জা করে মশাই। কিন্তু প্রবাসে নিয়মো নাস্তি। বাসার যা দশা শহরে, পেয়েছি যে এই ঢের, আসুন।'

স্মরজিৎবাবুর মত অত প্রচুর পরিমাণে না হলেও ছোট-খাটো একটা ফুলের বাগান লক্ষ্য করলাম এ বাড়ির উঠানে, গোলাপও দেখলাম দু'তিন রঙের।

ভবেশবাবু বললেন, 'সব মেয়ের শখ মশাই। না হ'লে ওসব ফুল ফল লতা পাতা, নাচ গান কি আমাদের মত মানুষের পক্ষে পোষায়! একে তো এতোগুলি পোষ্যি। তার পর মাসে মাসে আছে লম্বা লম্বা ডাক্তারের বিল।'

ছোট একতলা বাড়ি হলেও গোটা বাড়িটাই ভাড়া পেয়েছেন

ভবেশবাবু। পাশাপাশি তিনখানি ঘর। সামনে সরু বারান্দা আছে একফালি। অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। ভবেশবাবু নিতান্তই বিনয় করছিলেন। যুদ্ধের বাজারে জব্বলপুরের মত এমন একটি শরিকহীন বাড়ি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। ভবেশবাবুর কাছে শুনতে পেলাম এখানকার প্রভাবশীল একজন উকিল বন্ধুর অত্যন্ত আনুকূল্যেই এ বাড়ি জোটানো সম্ভবপর হয়েছে।

উত্তর দিকের ছোট ঘরখানিতে গিয়ে বসলুম। এখানে একধারে ভবেশবাবুর বৈঠকখানা, এবং ছেলেদের পড়বার আর শোবার ঘর। একদিকে ছোট ছোট দু'খানি টেবিল, পাশাপাশি দু'খানা করে চেয়ার আর একদিকে দু'খানা দড়ির খাটিয়ায় বিছানা গোটানো রয়েছে।

ভবেশবাবু বললেন, 'ঘরখানাকে কি রকম অগোছালো করে রেখেছে দেখ। আচ্ছা দুরন্ত হয়েছিস তোরা বাপু। ছেলেমানুষ তো আমরাও একদিন ছিলাম। কিন্তু তোদের মত এমন হুটোপুটি কোনদিন করেছি বলে তো কই মনে পড়ে না; বাদল, এঁকে এ ঘরেই বা বসালে কেন, একেবারে বাড়ির ভিতরেই নিয়ে চল না। নাকি ইনি সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চান না ?'

বললুম, 'তা নয়, চাই ঠিকই কিন্তু পেরে উঠি না।'

ভবেশবাবু হেসে উঠলেন, 'ঠিকই বলেছেন মশাই, সবাই সব কাজ করতে পারে না। নিজের ধরনেই তো বুঝতে পারি কিন্তু এরা সব গেল কোথায় ? জ্যোতি, ও জ্যোতি !'

—'যাই বাবা !'

পশ্চিম দিকের দরজা খুলে আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে এসে ঢুকল। ছোট ভাই বোনদের মত ফরসা নয়, রঙটি শ্যামবর্ণ ঘেঁষা কিন্তু এ চেহারায় অন্য কোন রঙ যেন ঠিক মানাতো না। আটপৌরে

সাধারণ একখানা শাড়ি পরণে। কিছুমাত্র প্রসাধনের ছাপ নেই কোথাও। বরং অবিন্যস্ত চুলের দিকে তাকিয়ে মনে হোল সাজ-সজ্জার প্রতি একটা অবজ্ঞাই আছে। সে অবজ্ঞা প্রায় অহংকারের মত। মেয়েটির শান্ত গাম্ভীর্য তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা গেল, এ মেয়ের যে ফুলের বাগানের শখ থাকতে পারে তা ভবেশবাবু না বললে বিশ্বাস করা শক্ত হোত।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভবেশবাবু বললেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এঁরা সব এলেন। উনি বাদলের বন্ধু। একই অফিসে কাজ করেন। পথ থেকে ধরে নিয়ে এলুম। আর অঞ্জনবাবু, এই হোল আমার মেয়ে জ্যোতি।'

জ্যোতি আমার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার জানাল। সংসারের গুরুদায়িত্বে এই বয়সেই মেয়েটি যেন একটু বেশিরকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কিংবা কে জানে এর প্রকৃতিই হয়তো এইরকম। ভবেশবাবু যেমন অত্যন্ত আপ্যায়নের সুরে ডেকে এসেছেন তাঁর মেয়ের নমস্কার এবং তাকাবার ভঙ্গিতে তেমন যেন স্নিগ্ধ প্রসন্নতা ফুটে উঠতে দেখলাম না। ভারি অপ্রস্তুত হলাম মনে মনে। বোধ হয় অসুখ বিসুখ আছে বাড়িতে, বোধ হয় নতুন কোন অভ্যাগতের জন্য এরা তেমন প্রস্তুত নয়। হঠাৎ এমনি করে না এলেই হোত। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি শান্ত মৃদু আর সুমিষ্ট কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

—'আপনার কথা বাদলদার কাছে এর আগেও শুনেছি।'

বললুম,—'আশ্চর্য, কিন্তু আপনাদের কথা বাদল আমার কাছে একেবারেই গোপন করে গেছে। বোধ হয় মাসিবাড়ির স্নেহের ভাগ ও আর কাউকে দিতে রাজী নয়।'

জ্যোতি আরক্তমুখে বাদলের দিকে একবার একটু তাকিয়ে নিয়ে বলল, —'তা ঠিক নয়। বরং মাসিবাড়ির স্নেহকেই ভারি ভয় আছে

বাদলদার। স্নেহের চেয়ে আমাদের মার শাসনের পরিমাণটাই বেশি। আর যেখানেই শাসন আছে সেখানেই বাদলদা নেই। বোধ হয় সেইজন্যই আমাদের বাড়ীর নামগন্ধও উনি কারো কাছে করতে চান না।'

বাদলও একবার জ্যোতির চোখের দিকে তাকায়, তার পর আমার দিকে ফিরে বলল সে,—'তাই বুঝি, ভারি তো ভয় দেখাচ্ছ মাসিমার শাসনের। যেন কারো শাসনের তোয়াক্কা রাখি আমি। বলে, মা আর দাদারাই হার মানলেন, আর মাসিমা তো মাসিমা! ভয় আমার মাসিমার শাসনকে নয় অঞ্জনদা, ভয় ওর কাতরানিকে। যে কদিন এখানে এসেছি কেবল অসুখ আর অসুখ। যে দুঃখে দেশ ছাড়লাম এখানে এসেও দেখি তাই। হবে না কেন, মারই তো বোন, রোগে ভুগতে পারলে ওরা আর কিছু চায় না অঞ্জনদা।'

জ্যোতি বলল, 'কথাগুলো একবার মার কাছে গিয়ে বলে দেখ, বুঝব সাহস।'

দেখে খুশি হলাম—একটু একটু করে মেয়েটির সেই আত্মসংকোচনের ভাবটা ক্রমে কেটে উঠছে। উজ্জ্বল প্রগল্‌ভতার আভাস খেলে যাচ্ছে মুখে। সেই শান্ত গম্ভীর দুটি চোখ যেন কিসের ছোঁয়ায় টলমল করছে তারল্যে। কত সামান্য কিছুতে যে মেয়েদের রূপ বদলায় তার ঠিক নেই। প্রসাধনের এক-আধটু অদল-বদলে তাদের একেকবার একেক রকম দেখায়, একেক জনের সঙ্গে তারা যেন একেক ভাষায় কথা বলে, শব্দগুলি হয়তো একই, কিন্তু ব্যঞ্জনা আলাদা।

'জ্যোতি!'

ভিতর থেকে একটু ক্লান্ত এবং যেন ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠ ভেসে এল।

জ্যোতি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'যাই মা।'

'বাদল এসেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে পাঠিয়ে দে এধারে, তাকে আমার পা টিপতে কি মাথা টিপতে বলব না, ভয় নেই তার।'

বাদল বলল, 'যেন বললেই আমি টিপতে বসে যাব আর কি। চলুন অঞ্জনদা, মাসিমার সঙ্গে আলাপ করে আসবেন।'

আমি জ্যোতির দিকে তাকালাম। জ্যোতি বলল, 'মা ব্লাডপ্রেসারে ভারি কষ্ট পাচ্ছেন। বেশি নড়াচড়া করতে বারণ করে দিয়েছেন ডাক্তার। উনিও প্রায় শুয়েই থাকতে চান সব সময়। কিন্তু সংসারের তাড়নায় শুয়ে থাকবার কি জো আছে।'

বললুম, 'আমি বরং এখানেই বসছি। উনি সুস্থ হয়ে উঠুন, আর একদিন এসে আলাপ করব। বাদল, তুমি গিয়ে তাড়াতাড়ি দেখা-সাক্ষাৎ সেরে এস ওঁর সঙ্গে।' ভবেশবাবু বাদ-প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না না না, সেকি। এখানেই বসবেন কি রকম। বাদল ঠিকই বলেছে, আপনি তো আচ্ছা লাজুক প্রকৃতির মানুষ মশাই। যে বাদলের মাসিমা, সে আপনারও মাসিমা, তাঁর কাছে আবার লজ্জা কিসের আপনার, চলুন চলুন।'

জ্যোতির চোখে মুখে যেন একটু বিব্রত ভঙ্গি ফুটে উঠল। কিন্তু ভবেশবাবু তা লক্ষ্য করলেন না কিংবা লক্ষ্য করেও গ্রাহ্য করলেন না। আমার হাত ধরে একটু টান দিয়ে বললেন, 'আসুন অত ইতস্তত করবার কোন কারণ নেই এখানে।'

ভবেশবাবুর পিছনে পিছনে তাঁদের শোবার ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। মাঝখানের এই ঘর বোধ হয় সবচেয়ে বড়। আধখানা ঘর জুড়ে একখানা তক্তপোশ। আর সেই পুরো তক্তপোশ জুড়ে ঢালা বিছানা। আমরা ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি লজ্জিত হয়ে উঠে বসলেন। মাথার কাপড়টা টেনে দিলেন কপাল পর্যন্ত।

মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আমাকে ডাকলেই তো যেতে পারতাম ওঘরে।' কথাটি ভবেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। ভবেশবাবু বললেন, 'আমরাই না হয় এঘরে এলাম, তাতেই বা কি হয়েছে। অত লজ্জা করতে হবে না তোমাকে, ইনি আমাদের বাদলের বন্ধু, অঞ্জনবাবু।'

দেখতে তেমন না দেখালেও বাদল আমার চেয়ে অন্তত সাত আট বছরের ছোট এবং অফিসেও তাঁর একধাপ উঁচুতেই আমার পদ। তবু এখানে এসে বার বার বিনা আপত্তিতে তার বন্ধুপদবাচ্য হতে হোল। বুঝতে পারলাম প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। কি একটা শ্লোক আছে, সংসর্গ অনুসারে হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হতে হয়। এমন যে লোলজিহ্বা খড়গধারিণী দীর্ঘাঙ্গী কালী তিনিও 'দাসের সঙ্গে' সংশ্লিষ্ট হয়ে হ্রস্বত্ব পেয়েছেন। কালিদাস শব্দটিই তার প্রমাণ। কিন্তু ভবেশবাবুর মুখে বারবার বাদলের বন্ধু বলে উল্লিখিত হওয়ায় নিজেকে শুধু যে একজন হৃতমান মনে হোল তা নয়। বরং কেমন যেন সকৌতুক উল্লাসই অনুভব করতে লাগলাম। বয়সের গুরুত্ব, পদের গুরুত্ব, প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য সবই যেন এখানে এসে হঠাৎ অনেকখানি হ্রাস পেয়ে গেছে। সেই সঙ্গে কি এক অপরূপ তৃপ্তির স্বাদ যেন পৌঁছেছে গিয়ে মনে।

দীর্ঘ পরিচয়ের পরও অনাত্মীয় কাউকে আমি আত্মীয় সম্বোধন জানাতে পারি না। কিন্তু আজ স্বভাবের ব্যতিক্রমে নিজেই বিস্মিত হলাম। ভবেশবাবুর কথার অনুসরণে হঠাৎ বলে বসলুম, 'সত্যি মাসিমা, বাদল আমার ভাই-এর মত। আমার কাছে কোন সঙ্কোচের কারণ নেই আপনার। আপনি শুয়ে শুয়েই কথা বলুন না।'

ততক্ষণে নীলরঙের একটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে বসেছেন ভবেশবাবুর স্ত্রী। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'একেবারে শুয়ে থাকবার মত অসুখও আমার নয়। কিন্তু

মেয়ে আমাকে সব সময় শুইয়ে রাখতেই ভালোবাসে। ছেলেবেলার প্রতিশোধ নেয় আমার ওপর।'

কথার ভঙ্গিটুকু বেশ লাগল। তিনি যে সত্যিই একেবারে পর্দানশীন নন দেখে আশ্বস্তই হলাম।

ভবেশবাবু বললেন, 'রাখবে না শুইয়ে? এ অবস্থায় আমার পক্ষে একটু বেশি সাবধান হওয়াই বরং ভালো। শেষে ভুগতে তো হয় আমাদেরই।'

ছোটছোট ছেলেমেয়েগুলি একটু দূরে ছিল দাঁড়িয়ে। কেবল সেই বছর দুয়েকের শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছিল বিছানায়। ভবেশবাবুর কথা শুনে বাদল আর জ্যোতি মুখ নিচু করল। ভবেশবাবুর স্ত্রী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আর তুমি থামো দেখি একটু। তোমার আবার ভোগ কিসের।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে টের পেলাম। এই রুগ্ন ক্ষীণ দেহেও অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন ভবেশবাবুর স্ত্রী। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি কোন কথা খুঁজে পেলাম না। কিন্তু পর মুহূর্তে বাদলের মাসিমা নিজেই বেশ সপ্রতিভ-ভাবে সামলে নিলেন, 'বাঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন আপনারা। বসুন। জ্যোতি, খান দুই চেয়ার এঘরে নিয়ে আয় না, তা-ও বলে দিতে হবে?'

অস্বস্তিকর মুহূর্তটুকু অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় সবাই খুশি হয়ে উঠলুম। জ্যোতিকে বাধা দিয়ে বাদলই ছুটে গেল পাশের ঘরে। 'তুমি চা টার ব্যবস্থা করো। চেয়ার টেবিল আমিই সাজিয়ে দিয়েছি।'

কেবল চা জলযোগের বন্দোবস্তই নয়, বাদলের জোর জবরদস্তিতে গানও শেষ পর্যন্ত গাইতে হোল জ্যোতিকে। প্রথমে সে অবশ্য গাইতে কিছুতেই রাজী হয়নি। তার শরীর ভালো নয়, গলা ভালো নয়, কাউকে শোনাবার মত গান সে জানে না,—ছোট বড় সব রকম

গায়ক-গায়িকার সেই পুরোনো মামুলি অজুহাতগুলি শুনতে শুনতে মনে মনে একটু বিরক্তই হয়ে উঠলাম। এক ফাঁকে একবার বলেও বসলাম, 'থাক না বাদল, ওঁর যদি শরীর সত্যিই খারাপ হয়ে থাকে, মিছিমিছি কেন ওঁকে উত্যক্ত করছ। গান না হয় আর একদিন এসে শোনা যাবে।' সত্যি বলতে কি, গান শোনার জন্য তেমন খুব আগ্রহ কি ঔৎসুক্য বোধ করছিলাম না। বরং ভাবছিলাম এখনো যদি বেরুনো যায়, স্মরজিৎবাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসা যাবে। ভদ্রলোকের কাছে বার বার খেলাপ হচ্ছে কথার। হয়তো ভাবছেন এড়িয়ে যাচ্ছি তাঁকে! তাঁর ছবি দেখবার ইচ্ছা আমার নেই।

কিন্তু বাদল নাছোড়বান্দা। আমার কথা শুনে বলল, 'উঁহু, ওকে অমন করে আস্কারা দেবেন না অঞ্জনদা। জানেন না, গান গাইতে বললেই এসব কৈফিয়তগুলি ঠোঁটের আগায় এসে থাকে জ্যোতির। ওকে জোর করে না গাওয়ালে কোন দিন গান শোনা যায় না ওর।'

গান গাইবে জ্যোতি। কিন্তু আমাকে গান শোনানোর গরজটা যেন বাদলেরই বেশী।

ভবেশবাবু আর তাঁর স্ত্রীও এর পর দু'একবার অনুরোধ করলেন মেয়েকে, 'এত করে যখন বলছে বাদল, গাইলিই বা একখানা গান। কখনো যে গাস্‌নে এমন তো নয়।'

অগত্যা যেন নিতান্তই অনিচ্ছায় হারমনিয়মটা জ্যোতি কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসল। তারপর বাদলের দিকে তাকিয়ে একটু যেন বিরক্ত আর শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'মাঝে মাঝে ভারি ছেলেমানুষী করো তুমি।'

বাদল বলল, 'মাঝে মাঝে কিন্তু মেয়েলি একগুঁয়েমি যে তোমার একেবারে সব সময়ের জন্য লেগে আছে। যতক্ষণ ধরে সাধাসাধি

করছি ততক্ষণে একখানা তো ভালো, এক কুড়ি গান আমি গেয়ে নামিয়ে দিতে পারতাম।'

বাদলের উচ্ছলতায় জ্যোতি মৃদু একটু হাসল, কোন কথা বলল না। বয়স দুজনেরই প্রায় সমান। হয়তো সামান্য কিছু ছোটই হবে জ্যোতি। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হোল বাদল যেন সত্যিই তার কাছে নিতান্তই একজন ছেলেমানুষ ছাড়া কিছু নয়। আর ছেলেমানুষ বলেই তার আব্দার অভিমান না রেখে যেন জো নেই জ্যোতির। একটু বাদে রীড টিপে জ্যোতি মৃদু স্বর তুলল হারমোনিয়মে, তারপর সেই স্বরের একটু উচ্চতর প্রতিধ্বনি তুলল কণ্ঠে।

খানিকটা তাচ্ছিল্য আর অবহেলার ভঙ্গিতেই গান শুনতে বসেছিলাম। গানে অল্পবয়সী মেয়েদের যে অশিক্ষিত পটুত্ব আছে তাতে গান শুনে খুশি হওয়ার প্রত্যাশা সব সময় করা যায় না, গান তারা গায় শুনেই খুশি হতে হয়। কিন্তু জ্যোতির গলা শুনে চমক্ লাগল, খুব শিক্ষা আর অনুশীলনের নৈপুণ্য যে আছে তা নয়, কিন্তু কণ্ঠের মাধুর্যটুকু ভারি তৃপ্তিকর।

'হে মহাজীবন হে মহামরণ,
লইনু শরণ লইনু শরণ

আন্তরিকতার আমেজ আছে গলায়। কথাগুলির ভাবরূপ যেন তার একান্ত নিজের। ফিরে ফিরে দু'তিনবার করে গাইল পদগুলি। সঙ্গীতের মাধ্যমে এ যেন তার নিজেরই আত্মনিবেদন।

গান থামলে একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'মিথ্যা বিনয় করেছিলেন এতক্ষণ; এমন চমৎকার গলা আপনার—'

গান গাইবার আগে জ্যোতির আপত্তি অজুহাতগুলির মত গান

শুনবার পর আমার প্রশংসার ভাষাও নিতান্তই যে গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে একথা সঙ্গে সঙ্গে মনে হওয়াতে থেমে গেলাম। ভাষায় ভাবে সব সময় মৌলিকতা রক্ষা করা বেশ একটু কঠিন সাধ্যই বটে। আন্তরিকতার চেয়ে সহজতর মৌলিকতর আর কিছু নেই।

জ্যোতির মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, ওসব দুঃখের গান ছাড়া কি অন্য রকম দু' একখানা হাসিখুশির গান তুই গাইতে পারিসনে জ্যোতি। তেমন গান তোর মুখে কোনদিন একটু শুনলুম না।' ভবেশবাবু বললেন, 'কি করে শুনবে। হাসিখুশির বয়স আছে নাকি তোমার মেয়ের? তাছাড়া ওতো সত্যি সত্যি তোমার মেয়ে নয়; পঁচিশ বছর আগে মরে যাওয়া তোমার সেই শাশুড়ী আবার ফিরে এসেছেন। একেবারে আমার মার মতন ধরন-ধারণ।'

ভবেশবাবু ফিরে চাইলেন আমাদের দিকে। বাৎসল্যের স্নিগ্ধতায় ভারি সুখী আর পরিতৃপ্ত দেখাল তার মুখ।

জ্যোতি কোন প্রতিবাদ করল না এ সব অভিযোগের। মার দিকে চেয়ে বলল, 'বাদলদাকে বল না মা গাইতে। হাসিখুশির গান দু' চারখানা শুনিয়ে দেবে।'

বাদল বলল, 'অত খোঁটা দিচ্ছ কেন। মনে করলে পারি না বুঝি গাইতে। কিন্তু গান গেয়ে তো ভালো, কাতুকুতু দিলেও বোধ হয় পৃথিবীতে তোমাকে কেউ হাসাতে পারবে না।'

জ্যোতির মা একটু হাসলেন, 'ঠিক বলেছিস। কাতুকুতু দেওয়ারই কাজ অমন মনগুমরো মেয়েকে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি রকম চটপটে ফুর্তিবাজ। চোখ জুড়োয় মুখের দিকে চাইলে। আর আমার মেয়ের সব উল্টো।'

বাদল তরল স্বরে বলল, 'মুখের দিকে চাইলে চোখ জ্বালা করে না মাসিমা?'

পরস্পরের দিকে একটু তাকিয়েই দুজনে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বারকয়েক অনুরোধ করেও জ্যোতিকে দিয়ে দ্বিতীয় কোন গান গাওয়ানো গেল না। জ্যোতির মা একটু বিরক্তি হয়ে বললেন, 'একবার যদি না করে ও মেয়ে, ওকে হাঁ করাবার এমন কেউ নেই চাঁদের তলে।'

ভবেশবাবু বললেন, 'তোমরা তো কেবল ওকে নিয়েই আছ। আরো যে দুঃখিনী গায়িকা মেয়ে আছে আমার, তাদের দিকে কেউই লক্ষ্য করছে না।' বাদল বলল, 'সত্যিই তো, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের। সীতা, রীতা, এবার লেগে যাও তোমরা। বাস, আর দেরি নয়, তোমাদের সেই মাস্টারপীস্—সেই কি একখানা আছে যেন, 'এল ঝড় এল ঝড় কাল-বৈশাখী।'

সীতার বয়স বছর আটেক। মুখ ভার করে বলল, 'বয়ে গেছে আমাদের গাইতে। মানুষের ঠাট্টা যেন আর বুঝি না আমরা। দিদির বেলায় এত সাধাসাধি।'

'আর বাবা মনে করিয়ে দিলেন, তবে চোখ পড়ল আমাদের দিকে। গাস্‌নে গীতা,. গান না শুনালে মরে যাব কিনা আমরা।' সুতরাং তাদের দিদির মত, সীতা রীতাকেও একটু সাধন ভজন না করে পারা গেল না। তা ছাড়া আরও লোভ দেখাতে হোল, মাসখানেক বাদে পয়লা বৈশাখ তারিখে প্রবাসী বাঙালীদের যে থিয়েটার আর গানবাজনার জলসা হবে তাতে যথাযোগ্য মর্যাদার অংশ সীতা রীতাকে সংগ্রহ ক'রে দেবে বাদল। এরপর সীতা রীতার নৃত্য সঙ্গীতে অবশ্য আর কোন বাধা ছিল না।

জ্যোতির ইশারায় সীতা একবার অনুরোধ করল বাদলকে, 'এবার আপনি একখানা গান দেখি বাদলদা, সবাইকে কেবল খোঁচান আর ঠাট্টা করেন, নিজে একখানা গেয়ে শোনান দেখি বুঝব ক্ষমতা।'

বুঝতে পারলাম বাথরুম থেকে বাদলের গুনগুনানি রোজ শোনা গেলেও প্রকাশ্যে গাইবার অভ্যাস যে তার নেই তা জ্যোতি আর সীতা রীতারা ভালো ক'রেই জানে। সময় বুঝে তাই তাঁরা এক হাত নিচ্ছে ওর ওপর। বাদল কিন্তু অত সহজে হটবার পাত্র নয়। গান অবশ্য সে গাইল না। কিন্তু জ্যোতির গলার স্বর আর বলার ভঙ্গির যথাসাধ্য বিকৃত অনুকরণ ক'রে বার বার বলতে লাগল যে গান গাইবার ইচ্ছা তো তার ছিলই, কিন্তু কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে শরীরটা, গলাটা ভেঙে গেছে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে, তাছাড়া শোনবার মত গান গাইবার যোগ্যতা কি তার আছে? সেই সঙ্গে প্রায় জ্যোতির মত বিনয়ের এমন এক অপরূপ ভঙ্গি করল বাদল যে হাসতে হাসতে সীতা রীতারা মেঝেয় লুটোপুটি খেতে লাগল। হাসতে লাগলেন ভবেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী, আমিও না হেসে পারলাম না। জ্যোতির প্রথমটায় ভারি রাগ হয়েছিল কিন্তু শেষের দিকে দেখলাম, সেও আঁচল চেপেছে মুখে।

বাদল আড়চোখে একবার সেই আঁচলচাপা মুখের দিকে তাকাল, তারপর তার মাসিমার দিকে চেয়ে বলল, 'দেখলেন তো, এবার স্বীকার করলেন তো ক্ষমতা।'

প্রথমটায় যেন বুঝতে পারলেন না বাদলের মাসিমা কিন্তু বাদল ইশারায় জ্যোতিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'কাতুকুতুর মহিমার কথা বলছি।' বাদলের মাসিমা হেসে বললেন, 'ওঃ, তা তোমার অসাধ্য কোন কাজ নেই বাপু। তুমি সব পারো।'

'অসভ্য কোথাকার' বলে পাশের দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জ্যোতি। বাদল গেল পিছনে পিছনে। যাওয়ার আগে একবার আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'সভ্যতার বহর দেখুন। বাইরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসবে। তবু পাঁচজনের সামনে দাঁত দেখাবে

না।' হাসতে হাসতে ভবেশবাবুর স্ত্রী বোধহয় একটু শ্রান্তি বোধ করছিলেন, এবার শুয়ে পড়লেন।

ভবেশবাবু বললেন, 'এতও পারে বাদল। যেদিনই আসবে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে টেপিয়ে অস্থির করে তুলবে।'

মিনিট কয়েক বাদেই অবশ্য ফিরে এল বাদল, বলল, 'না মাসিমা ঠাণ্ডা করা গেল না কিছুতে। ভারি চটে গেছে।'

বাদলের মাসিমা হেসে বললেন, 'চটবে না? তুই ওকে এমন করে অপদস্ত করবি আর পাঁচজনের মধ্যে, আর ও বুঝি খুব খুশি হবে?'

বাদল বলল, 'চটেছে অপদস্থ হয়েছে বলে নয়, জোর করে তাকে হাসানো হয়েছে বলে। যে মেয়ে হাসবে না, তাকে হাসানো কি কম অপরাধ নাকি, বাপরে বাপ।'

বাদলের মাসিমা তার কথায় ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললেন, 'হয়েছে বাপু, এবার থামো ঃ আর অস্থির করে তুলো না আমাকে।'

আরো দু'চার মিনিট একথা-ওকথার পর বিদায় নেওয়া গেল। ভবেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই বার বার অনুরোধ করলেন সময় পেলেই যেন বাদলের সঙ্গে মাঝে মাঝে যাই তাঁদের ওখানে। যেন কোনরকম লজ্জা সঙ্কোচ না করি।

রাস্তায় বেরিয়ে বাদল জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগল অঞ্জনদা?'

বললুম, 'বেশ, ভারি ভালোমানুষ তোমার মেসোমশাই আর মাসিমা। বেশ মিশুকে। প্রথম দিনেই কেমন একেবারে আপনার জনের মত ব্যবহার করলেন।'

বাদল বলল, 'হ্যাঁ, খুব ভালবাসেন ওঁরা লোকজন। তারপর জ্যোতির গান শুনলেন কেমন?'

বললুম, 'ভালোই তো। গলা তো বেশ মিষ্টি। চর্চা করলে আরো ভালো হবে।'

বাদল বলল 'হুঁ, ও আবার করবে চেষ্টা। সেই মেয়েই কিনা। কোন দিকে যদি কোন খেয়াল থাকে। চেষ্টা যত্ন করে কোন কিছু শিখবার মতো ইচ্ছাই নেই ওর। ইংরেজী বাংলা যা জানে একটু পড়াশুনা করলেই দিতে পারে ম্যাট্রিকটা। কিন্তু ফাঁক পেলেই যত রাজ্যের বাজে বই পড়বে। কোর্স ধরে পড়াবার চেষ্টা করেছি। তাতে যেন গায়ে জ্বর আসে ওর। এমন অদ্ভুত স্বভাব।'

হেসে বললুম, 'তুমি আবার বলছ কাকে। তোমারও তো শুনলুম এই দশা। আই-এটা পড়তে পড়তে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এইবারে একটা চাকরিতে ঢুকেছ।'

বাদল বলল, 'ও, মেসোমশাই সব বলে সেরেছেন বুঝি। কোন কথা গোপন থাকে না ওঁর পেটে। তা আমার কথা ছেড়ে দিন। বই পড়ে তো নিজেরাও দেখলেন। কি লাভ হোল। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিওরী আছে অঞ্জনদা।'

বললুম, 'বল শুনি।'

বাদল বলল, 'যুদ্ধের বাজারে সোনাদানার দাম তো অনেক বেড়ে গেছে। তা দিয়ে মা বোন স্ত্রী কন্যাকে সাজাবার খরচ অনেক। কজন পুরুষের পক্ষে আর তা পোষায়। তার চেয়ে একটু পড়িয়ে টরিয়ে ইউনিভার্সিটির দু'একখানা সার্টিফিকেট তাদের যোগাড় করে দেওয়া বরং অনেক সহজ। কি বলেন ?'

বললুম, 'তাই কি ?'

বাদল বলল, 'তাই আমার প্রস্তাব, ওদের সার্টিফিকেটী বিদ্যা শুধু মেয়েদেরই ভূষণ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হোক। পুরুষের পক্ষে কেবল পৌরুষই যথেষ্ট। মাথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকে তা হ'লে তো কথাই নেই। শাড়ি গয়নার মত পড়াশুনার ফ্যাসনটা কেবল মেয়েদের দখলেই থাকা উচিত, এর আগে তাই ছিল। নইলে বিদ্যার

দেবতা খ্রীয়ম ঈপ্. সরস্বতী হবে কেন ? তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মধ্যে বিদ্যার পোর্টফলিও নেওয়ার জন্য কি আর কোন পুরুষ দেবতাকে খুঁজে পাওয়া গেল না ?'

বললুম, 'তোমার গবেষণার মৌলিকতা আছে বাদল, একটি প্রবন্ধ এ নিয়ে লিখে ফেলতে পারো।'

বাদল ঘাড় নেড়ে বলল, 'ফের আবার লেখালেখির কথা বলছেন ? বললুম তো, ওসবের মধ্যে আমি নেই। দরকার থাকে মাথাটা ধার নিতে পারেন আমার। লিখতে হবে আপনাকে।'

বললুম, 'তার চেয়ে তুমিই কলমটা ধার নেও না কেন, দেখই না ধরে ধরে একটু চেষ্টা করে।'

বাদল বলল, 'উঁহু, ও কাজ আমার নয়। ওকি, এখনই মেসের দিকে ফিরছেন যে ? চলুন না আরও একটু ঘুরেটুরে বেড়ানো যাক।'

বললুম, 'না না, রাত হয়ে গেছে। চল এবার ফিরি।' বাদল একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই আমার পিছনে পিছনে এল, বলল, 'না, আপনি ভারি বেরসিক মানুষ অঞ্জনদা, কোন রস কস নেই আপনার মনে।'

স্বীকার করে বললুম, 'সে কথা ঠিক।' কিন্তু বাদলের বোধ হয় রসের প্রসঙ্গ ফের মনে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'উঁহু, মোটেই ঠিক নয়। কেবল বর্ণচোরা নয়, আপনি একেবারে স্বভাবচোরা মানুষ। ঠিক একেবারে খেজুর গাছের মত ধরন-ধারণ। ওপরটি দেখে ঠিক বুঝবার জো নেই। জ্যোতি কিন্তু আপনাকে দেখেই ঠিক চিনে ফেলেছে !'

বললুম 'তাই নাকি ? কি রকম চিনেছে শুনি ?' বাদল বলল, 'জ্যোতি বলল কি জানেন, আপনি নিশ্চয়ই খুব গানের ভক্ত। আপনার মত অমন মুগ্ধ হয়ে গান শুনতে সে নাকি আর কাউকে দেখেনি।' একটু বিস্মিতই হ'লাম। তাহলে কি আমার দেখাটা ভুল। আমি

দেখছিলাম জ্যোতি আত্মমগ্ন হয়ে গান গাইছে। আর জ্যোতি দেখেছে আমি আত্মমগ্ন হয়ে শুনেছি। তা হ'লে কার দেখাটা সত্য ?

বললুম, 'এসব তোমায় নিশ্চয়ই বানানো কথা। খানিকক্ষণ আগেই তো তোমার মাসিমার কাছে বললে, তাকে নাকি ঠাণ্ডা করে আসতে পারো নি। চটিয়েই রেখে এসেছ। অমন চটানো অবস্থার মধ্যে এসব আলাপের তোমাদের সুযোগ হ'ল কি ক'রে ?'

হঠাৎ থমকে গিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বাদল কি যেন দেখতে চেষ্টা করল। তারপর বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলল, 'বাঃ, চটিয়েছি তো আমি! কিন্তু তাতে আপনার ওপর তার খুশি হ'তে বাধল কিসে।'

বললুম, 'হঠাৎ আমার ওপর খুশি হতেই বা যাবে কেন সে ?'

বাদল বলল, 'বাঃ খুশি হবে না! অতখানি প্রশংসা করলেন আপনি তার গানের। সুখ্যাতির সামান্য একটু ছিঁটা-ফোঁটায় মেয়েরা মনে মনে নাচতে থাকে। আর তো একেবারে যাকে বলে অজস্র প্রশংসা। ভালো কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম আর একটু হলে। এই নিন।'

বলে ছোট ছোট দুটি গোলাপের তোড়া পকেট থেকে বের করে আনল বাদল।

বিস্মিত হয়ে বললুন, 'ও আবার কি!'

বাদল বলল, 'আপনার প্রশংসার ফল। এখানে অবশ্য ফুল, ফলের চেয়ে ফুলই আপনি বেশি ভালোবাসেন, সে কথাটাও ওকে বলেছি কিনা।'

গম্ভীরভাবে বললুম, 'হুঁ,'। তারপর একটি তোড়া তুলে নিলুম বাদলের হাত থেকে ।

বাদল বলল, 'দুটোই নিন না।'

হেসে বললুম, 'না বাদল, দুটো যে দুজনের জন্য সেটুকু বুঝতে পেরেছি।

বাদল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটু বুঝে দেখতে চেষ্টা করল, তারপর বলল, 'বুঝবেন না কেন। একটা হোল প্রশংসার প্রতিদান, একজন বিশেষ জনের জন্য, আর একটি নিতান্তই ভদ্রতা—

হেসে বললুম, অনুপ্রাসটি ভুলে যাচ্ছ কেন বাদল, বল না সাধারণ সৌজন্য।'

ব্যাঙ্কের কলাপ্‌সিব্‌ল গেটের কাছে এসে পৌঁছলাম। ঢং ঢং করে অনেকগুলি শব্দ হোল ঘড়িতে। দশটা? না অত কম নয়, বোধ হয় এগারোটাই বাজে। রাত কম হয়নি।

তিন

দিন দুই পরে স্মরজিৎবাবু এসে দেখা দিলেন ব্যাঙ্কে। আমার টেবিলের উপর টুপিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'কি, গেলেন না যে! রাগ এখনো পড়েনি বুঝি?'

বিশেষ ভিড় ছিল না কাজের। সামনের চেয়ারটা খালিই পড়ে ছিল। তাঁকে বসতে অনুরোধ করে বললুম, 'সে কি, রাগ আবার কিসের?'

স্মরজিৎবাবু চেয়ারটায় বসে বললেন, 'ও রাগ নয়? মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়াটা কি তাহলে চাপা অনুরাগের লক্ষণ বলে বুঝে নেব?'

লেজারে কাজ করছিল বাদল, একবার ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে ফের মোটা লেজার বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

মনে মনে একটু বিরক্তি বোধ করলাম। বাদলের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। বুঝুক আর না বুঝুক, প্রত্যেক ব্যাপারেই ওর একবার করে নাক ঢোকানো চাই।

বাদলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে স্মরজিৎবাবুকে বললুম, 'রাগ অনুরাগের চেয়ে "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" প্রবচনটিই বোধ হয় এখানে প্রযোজ্য। কদিন ধরেই আপনাদের ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু প্রতিবারই একটা না একটা—।'

আমার কথায় বাধা দিয়ে স্মরজিৎবাবু হেসে বললেন,—'বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার স্ত্রীর অনুমান সে বাধা আপনার ছেলেমানুষী অভিমান ছাড়া আর কিছু নয়। প্রথম দিন ছবি দেখতে গিয়ে আপনাকে ফিরে আসতে হয়েছে বলেই আপনি ফের আর ও-মুখো হচ্ছেন না।'

কথাটা যে একেবারে মিথ্যে তা নয়। তবু সরাসরি এমন অভিযোগ স্বীকার করাও চলে না। আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'এসব বোধ হয় আপনার নিজেরই মনের কথা স্মরজিৎবাবু। মিছামিছি অন্যের মুখের কথা বলে চালাতে চাচ্ছেন। না হলে কোন ভদ্রমহিলা আমার সম্বন্ধে অমন ধারণা করতে পারেন না। লোক চিনতে তাঁদের অত ভুল হবার কথা নয়।'

স্মরজিৎবাবু হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'উহুঁ, যা ভেবেছিলাম তা তো নয়, আপনিতো মশাই খুব সহজ লোক নন। একজনের মনের কথা যে আর একজনের মুখের কথা বলে চালান যায় একথা আপনি জানলেন কি করে?'

বললুম,—'বাঃ এটা জানা কি অতই শক্ত?'

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'আচ্ছা, সহজ কি শক্ত সে আলোচনা পরে হবে, এবার চলুন।'

বিস্মিত হয়ে বললুম 'এখনি! সে কি করে হয়!' স্মরজিৎবাবু বললেন, 'খুব হবে। ছুটির জন্য ভাববেন না। সে আমি মঞ্জুর করিয়ে নিচ্ছি।'

একাউণ্টেণ্ট নীলকান্তবাবুর দিকে তাকালেন স্মরজিৎবাবু, 'কি মশাই, রাখবেন তো অনুরোধ?'

'পাঁচটায় তো আপনাদের ছুটি। এখন সাড়ে তিনটে! ঘণ্টা দেড়েকের জন্য দয়া করে ছেড়ে দিন না এই ভদ্রলোককে।'

বললুম, 'না না না স্মরজিৎবাবু। অনেক কাজ আছে হাতে।'

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'আঃ কেন মিথ্যে অজুহাত দিচ্ছেন মশাই। কাজের মানুষ যে আপনি নন তা আপনাকে দেখেই চিনেছি।' তারপর আবার তিনি তাকালেন নীলকান্তবাবুর দিকে—'কি মশাই, মঞ্জুর করলেন তো ছুটি?'

নীলকান্তবাবুর মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে উঠছিল। স্মরজিৎবাবু তা লক্ষ্য করে বললেন, দেখবেন মশাই। অগ্রপশ্চাৎ ভেবেচিন্তে কথা বলবেন। বিদেশে বিভুঁয়ে ডাক্তার মানুষকে চটাবেন না।'

নীলকান্তবাবু ঠোঁটের ওপর জোর করে একটু হাসি টানলেন: 'আমার আর আপত্তি কি ডাক্তারবাবু। অঞ্জনবাবুর হাতে যদি জরুরী কোন কাজ না থেকে থাকে—'

স্মরজিৎবাবু বোধ হয় আর একটু সৌজন্য আশা করেছিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশ, তাহলে থাক।'

নীলকান্তবাবু এবার একটু জোর করা ভদ্রতা দেখিয়ে বললেন, 'আমার কিন্তু মোটেই আপত্তি নেই ডাক্তারবাবু। অঞ্জনবাবু নিজে যদি কোন অসুবিধা না বোধ করেন, উনি যাবেন তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে।'

বুঝলুম, নীলকান্তবাবুর ইচ্ছা নয় আমি যাই। কিন্তু হাতে সত্যিই

যে তেমন কোন জরুরী কাজ নেই তা তিনি জানেন। তাঁর এই অতিরিক্ত নিয়মানুবর্তিতা ঠিক প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারলুম না, বরং একটু অতিমাত্রায় জোর দেখিয়েই তাঁর অনিচ্ছুক ভাবটিকে অগ্রাহ্য করে বললুম, 'তাহলে চলুন স্মরজিৎবাবু। নীলকান্তবাবু স্বাস্থ্যবান পুরুষ, তিনি ডাক্তার কবরেজকে একটু-আধটু চটালে চটাতে পারেন, কিন্তু আমার অতখানি সাহস হয় না, ভারি ভয় আপনার তেতো ওষুধ আর ইনজেকশনকে !'

কাগজপত্র গুছিয়ে দেরাজ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালুম। নীলকান্তবাবু একবার গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ফের মাথা নিচু করে নিজের কাজে মন দিলেন, কোন কথা বললেন না।

বেরিয়ে এসে মোটরে উঠে স্টার্ট দিতে দিতে মৃদু হেসে স্মরজিৎবাবু বললেন, 'ভালো করলেন না মশাই, বস্‌কে চটিয়ে এলেন, চাকরি নিয়ে শেষে একটা গোলমাল টোলমাল না বাঁধে।'

হেসেই জবাব দিলুম, 'বাধলই বা, আপনি কি এক আধটা চাকরি বাকরি এই শহরে জুটিয়ে দিতে পারবেন না।'

স্মরজিৎবাবু পরিহাসের সুরে বললেন, 'সেই ভরসাতেই আছেন বুঝি ? আমি বড় জোর আমার ডিসপেনসারীতে একটি কম্পাউণ্ডারী দিতে পারি। পারবেন করতে ?'

বললুম, 'না ডাক্তারবাবু, রসায়নে মোটেই অধিকার নেই। কিন্তু আপনার কারবার তো কেবল রসায়ন নিয়েই নয়, রঙ নিয়েও। তাতেই না হয় লাগিয়ে দেবেন—তুলি টুলি ধোয়া মোছার কাজে।' স্মরজিৎবাবু আর একবার তাকালেন আমার দিকে, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'উহুঁ, যতদূর চিনেছি, তা ও আপনার দ্বারা হবে না মশাই। আপনি একেবারেই কোন কাজের মানুষ নন।'

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললুম, 'তবে কিসের মানুষ ?'

স্মরজিৎবাবু আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'কেবল কথার।'

একটু থেমে ফের আবার বললেন, 'রাগ করলেন? কিন্তু কথা মানেই তো কেবল বাজে কথা নয়, মনের কথাও বটে। মনের কথা শুনবার আর শোনাবার মানুষ খুব বেশী মেলে না অঞ্জনবাবু। কাজের মানুষের চেয়ে তারা ঢের বেশি দুর্লভ।'

শেষ দিকটায় স্মরজিৎবাবুর কণ্ঠ মোটেই আর তরল মনে হোল না, বরং বেশ একটু বিষাদ আর গাম্ভীর্যেরই আমেজ এল তাঁর গলায়।

একটু বাদেই বাড়ির দোর গোড়ায় গাড়ি এসে পোঁছল। দুদিকে গোলাপের ঝাড় আর মাঝখানে সেই সরু লাল সুরকির পথ বেয়ে স্মরজিৎবাবুর পিছনে পিছনে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। গাড়ির শব্দে সেই মারাঠি ঝি-টি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। স্মরজিৎবাবু তাকে দেখে বললেন, 'রঞ্জা, মাজীকে বল অঞ্জনবাবু এসেছেন।'

সিঁড়িতে লঘু পায়ের শব্দ শুনা গেল। শ্রীলেখা দেবী স্মিতমুখে এসে দাঁড়ালেন সামনে। আমার নমস্কারের জবাবে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আসুন! আশা করি সেদিন কিছু মনে করেন নি।' বললুম, 'না না, মনে করবার কি আছে। বারবার ও কথা উল্লেখ করেই বরং লজ্জা দিচ্ছেন।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন, 'আজ কিছুটা ক্ষতিপূরণ হবে আশা করছি। পুরনো ছবির সঙ্গে ওঁর সদ্য-আঁকা একখানা নতুন ছবিও আজ আপনাকে দেখাতে পারব।'

স্বামীর ছবি সম্বন্ধে মিসেস মুখার্জীর উৎসাহের আধিক্যে যেন একটু কৃত্রিমতা রয়েছে বলে মনে হোল। এর আগের দিন স্মরজিৎবাবুর ছবি আঁকা সম্পর্কে তিনি যে ঔদাসীন্য এমন কি খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ

করেছিলেন আজ যেন তাই ঢাকবার জন্য আগে থাকতেই তৈরি হয়ে নিয়েছেন, কিন্তু সেই তৈরি হওয়ার ভঙ্গিটুকু ঢাকতে পারেন নি কিংবা কে জানে বোধ হয় ঢাকতে চানও নি।

স্ত্রীর এই ছদ্ম উৎসাহে স্মরজিৎবাবু কিন্তু হঠাৎ খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর দিকে চেয়ে সলজ্জ আপত্তির সুরে বললেন, 'বাঃ, তুমি ভেবেছ বুঝি ছবি দেখাবার জন্যই ওঁকে আমি বাড়িতে ডেকে এনেছি।'

মিসেস মুখার্জী বললেন, 'তুমি আনবে কেন, আমিই আনিয়েছি। দেখাবার গরজ বুঝি আর আমার নেই।'

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'না না, ও সব ছবি টবি থা'ক, বরং বেশ খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করা যাবে তার চেয়ে।

মিসেস মুখার্জী মৃদু একটু হাসলেন, তারপর সিঁড়ির গোড়ায় পা দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আসুন।'

দোতলার দক্ষিণ দিকের একখানা ঘরের সামনে এসে কালো রঙের পর্দাটা তুলে ধরলেন শ্রীলেখা দেবী, আমরা দুজনে তাঁর পিছনে পিছনে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। বেছে বেছে বেশ পছন্দমত ঘরেই স্টুডিয়োটি করেছেন স্মরজিৎবাবু। দক্ষিণ খোলা বেশ বড় একখানি হলঘর। সামনে রেলিং-ঘেরা ছোট্ট একটি বারান্দা আছে। খোলা জানালা দিয়ে খানিকদূরে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি চোখে পড়ল। বিকালের লালচে পড়ন্ত রোদে রঙ বদলে গেছে গাছ-পালাগুলির।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে স্মরজিৎবাবু বললেন, 'ভারি সুন্দর, না?' সকালে বিকালে রোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি জায়গাটা। তবু যেন পুরনো হয় না। এত চেষ্টা করলুম অমন সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ কিছুতেই আঁকতে পারলুম না। এক এক সময় করি কি জানেন, এদিককার সমস্ত দোর জানালা বন্ধ করে রাখি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'কেন?'

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'ভিতরের রঙশালাটা তাতে আরো স্পষ্ট দেখতে পাব সেই আশায়!'

শ্রীলেখা দেবী একটি ছবির অ্যালবাম আমাদের সামনের ছোট টেবিলটির ওপর রাখতে রাখতে হঠাৎ স্বামীর কথার জবাব দিয়ে উঠলেন, 'কিন্তু সত্যিই কি পাও? চোখ বুজলে যে রঙশালাটা দেখতে পাওয়া যায়, অন্ধকার থেকে সেটি কি আলাদা?'

বেশ একটু ঝাঁজ আছে যেন শ্রীলেখা দেবীর কথায়। আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলেন। একটু চুপ করে থেকে স্মরজিৎবাবুকে বললুম, 'আমারও সায় আছে মিসেস মুখার্জীর কথায়, চোখ বুজবার তত্ত্বটা অন্তত আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনি শিল্পী। তা ছাড়া—'

স্মরজিৎবাবু একটু হেসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে ফের আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তাছাড়া চোখ খুললেই যখন শোভন একখানা মুখ যে কোন মুহূর্তে দেখতে পারি, কি বলুন?'

শ্রীলেখা দেবী কেবল আরক্তই হলেন না, একটু যেন বিরক্তও হলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি বরং ততক্ষণ ছবিগুলো দেখুন, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি রঞ্জার।'

আমরা কোন কথা বলতে না বলতে শ্রীলেখা দেবী দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দোরের কালো পর্দাটা মুহূর্তের জন্য আন্দোলিত হয়ে উঠে স্থির হয়ে রইল।

বসে বসে ছবির অ্যালবাম দেখতে লাগলাম স্মরজিৎবাবুর। নানা ধরনের মুখ, মেয়েদের মুখই তার মধ্যে বেশী, পাহাড়, ছোট ছোট পাহাড়ে নদীর ঝরনা, উপত্যকা, শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের খণ্ড খণ্ড অংশ, হাট-বাজার, হাসপাতাল, রোগশয্যায় রোগীর মুখে বিভিন্ন অভিব্যক্তি।—নানা রকম ছবিই এঁকেছেন স্মরজিৎবাবু।

চিত্রশিল্পের কলাকৌশলে অনভিজ্ঞ আমার মত দর্শক এসব ছবির সামনে বেশ একটু নিশ্চিন্ত আর আশ্বস্ত হয়ে বসতে পারে। বেশ সহজ, প্রাঞ্জল, পরিচিত ধরনের পরিবেশ। অনেকগুলি ছবিই দেখতে বেশ মনোরম। কোন রকম জটিল দুর্বোধ্যতা কিছু নেই। এসব ছবি দেখে চোখের আর মনের প্রসন্নতা মোটামুটি বজায় থাকে। কিন্তু মন তো শুধু প্রসন্ন হয়েই সন্তুষ্ট হয় না। সে অপ্রত্যাশিতকে কামনা করে, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভকে চায়। স্মরজিৎবাবুর কোন ছবির মধ্যেই তেমন বিস্ময়কর, চমকপ্রদ কিছু পেলাম না, তবে খুব যে ক্ষুণ্ণ আর হতাশ হলাম তা নয়। কারণ এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা স্মরজিৎবাবুর কাছে ছিল না। কিন্তু স্মরজিৎবাবু খুব স্বল্পে সন্তুষ্ট নয় দেখলাম। তিনি আমার মুখের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিলেন। এক একখানি ছবি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছিলেন, ‘কেমন লাগছে ?’

বললুম, ‘চমৎকার।’

স্মরজিৎবাবু বললেন, ‘নিজের মনের কথা বললেন, না আমার মনের মত করে বললেন ?’

বললুম, ‘দুই-ই।’

সংক্ষিপ্ত জবাবটুকুর মধ্যে হয়তো বিরক্তি আর বীতস্পৃহা প্রকাশ পেয়ে থাকবে। স্মরজিৎবাবু আর কিছু বললেন না। একটু বাদে উঠে গিয়ে আর একটি অ্যালবাম নিয়ে এলেন হাতে করে। বললেন, ‘দেখুন এটিও, এগুলি একেবারে গোড়ার দিকের চেষ্টা। আদি কালের বলেই হয়তো একটু আদি রসের বাহুল্য আছে, তবু চোখ খুলেই যে তুলি ধরেছিলাম, তা বুঝতে পারবেন !’

বললুম, ‘বুঝতে তা বাকি নেই স্মরজিৎবাবু। আপনার প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই খোলা চোখের পরিচয় আছে।’

দ্বিতীয় অ্যালবামখানা খুলতেই শ্রীলেখা দেবীর রঙীন প্রতিকৃতি চোখে পড়ল। দেখলুম, বিশেষ বিনয় করেন নি স্মরজিৎবাবু। এ চিত্র প্রথম দিকের চেষ্টা বলে বেশ বোঝা যায়। রঙে রেখায় কামনার উগ্রতাও বেশ চোখে পড়ে।

পাতা উল্টে উল্টে আরো তিন চারখানি ছবি দেখলাম। প্রায় একই ধরনের। কোনটিতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শিথিলবাস বক্ষের দিকে কৌতূহলী চক্ষে তাকিয়ে রয়েছেন, কোনটিতে সদ্য স্নান করে ফিরে এসেছেন, ভিজে বেশবাসের আড়ালে তনুদেহের রেখাবর্ণ আর উদ্ধত বক্ষযুগ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আর একখানা ছবিতে শ্রীলেখা দেবী একটি আধফোটা গোলাপকে অত্যন্ত তীব্র আবেগে ঠোঁটে চেপে ধরেছেন। কয়েকখানা ছবির মধ্যে এইখানিই আমার সব চেয়ে ভাল লাগলো, তবু খানিকটা ব্যঞ্জনা আছে, আভাস আছে, এ ছবির মধ্যে রঙের ভাষায় সমস্ত বক্তব্য পুরোপুরি উচ্চারিত হয় নি। স্মরজিৎবাবু সেই খোলা ছবিটির দিকে চেয়ে একটু দেখলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'অনেক ভুল চুক আছে। তবু প্রথম প্রেরণার উৎসমূল আপনাকে দেখালাম।'

পর্দা সরিয়ে শ্রীলেখা দেবী ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছবির অ্যালবাম বন্ধ করে ফেললেন স্মরজিৎবাবু। শ্রীলেখা দেবী একবার সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। মুহূর্তের জন্য সুগৌর মুখে গাঢ় রক্ত রঙ ছড়িয়ে পড়লো। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন শ্রীলেখা দেবী।

স্মরজিৎবাবু দুটি অ্যালবামই স্ত্রীর হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার সব তুলে রাখো। আমাদের দেখা শেষ হয়েছে।'

ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে এনে রঞ্জা এল ঘরে। শ্রীলেখা মুখ নিচু করে কেটলি থেকে কাপে চা ঢালতে লাগলেন, কোন কথা বললেন

না। আমরাও নিঃশব্দে চুমুক দিলাম কাপে। মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিকর স্তব্ধতায় ঘরখানা থমথম করতে লাগল।

কিন্তু একটু বাদেই ফের আবার সহজ হয়ে উঠলেন শ্রীলেখা দেবী। আমার দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে তরল স্বরে বললেন, 'বাঃ চুপ করে রইলেন যে। ছবি দেখলেন, এবার আলোচনাটা সমালোচনাটা একটু শোনান।'

হেসে বললুম, 'অমন কঠিন আদেশ করবেন না মিসেস মুখার্জী। আমরা সাধারণ দর্শক, দু'চোখ মেলে কেবল দেখতেই জানি। সমালোচনার জন্য যে তৃতীয় লোচন থাকা দরকার তা আমাদের নেই, বরং ছবিগুলো আপনার কেমন লাগছে তাই বলুন।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন, 'বাঃ রে। তৃতীয় নয়ন কি আমারই আছে নাকি যে আমি বলব? কপালে যা দেখতে পাচ্ছেন ওটা কিন্তু নয়ন নয় অঞ্জনবাবু, সিঁদুরের ফোঁটা।'

শ্রীলেখা দেবীর কথার ভঙ্গিতে দুজনেই হেসে উঠলুম। চাপা হাসির আভায় ওর মুখখানিও উদ্ভাসিত দেখাল। কিন্তু চা শেষ করে চুরুট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্মরজিৎবাবু বললেন, 'ঠিক কথা বলছ তো লেখা? সত্যই কি ফোঁটা, না রক্তচক্ষু ওটা?'

পরিহাসের ভঙ্গিতেই কথাটা বললেন স্মরজিৎবাবু কিন্তু সুরটা ঠিক যেন পরিহাসের বলে মনে হোল না। শ্রীলেখা দেবীর স্মিত সুন্দর মুখখানি হঠাৎ মুহূর্তের জন্য সাদা ফ্যাকাশে দেখাল। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করে একটু হাসি টেনে কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। দরজার কালো পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল রঙ্গা—'মা জী!'

শ্রীলেখা বললেন, 'কি!'

'কমলাক্ষবাবু অপেক্ষা করছেন নিচে।'

শ্রীলেখা দেবীর মুখের রঙ আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো কিংবা

স্বাভাবিকের চেয়েও একটু বেশি রক্তাভ দেখাল যেন, বললেন, 'নিয়ে আয় এখানে।—আচ্ছা, আমিই না হয় যাচ্ছি।' তার পর আমার দিকে ফিরলেন শ্রীলেখা দেবী, 'আপনারা কথা বলুন, ওঁকে সঙ্গে করে এক্ষুনি আসছি।' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্মরজিৎবাবু একবার তাকালেন তার দিকে। কিন্তু কোন কথা বললেন না। নিচের সিঁড়িগুলিতে শ্রীলেখা দেবীর দ্রুত পায়ের শব্দ ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল। আমরা নিঃশব্দে ওঁদের ফিরে আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

মিনিট পাঁচেক পরেই শ্রীলেখাদেবী একাই এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে আর কাউকে দেখা গেল না।

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'কই কমলাক্ষবাবু এসেছেন শুনলুম যে।'

শ্রীলেখা দেবী মৃদুস্বরে বললেন, 'এসেছিলেন, আবার চলে গেলেন।' একটু যেন উদ্বিগ্ন, একটু যেন বিষণ্ণ আর শ্রান্ত মনে হোল শ্রীলেখা দেবীকে।

বললুম, 'সে কি! চলে গেলেন কেন?'

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই গেলেন? এলেনই বা কেন, আর গেলেনই বা কেন।' স্মরজিৎবাবু স্ত্রীর দিকে তাকালেন, —'কিন্তু তুমি অমন করছ কেন?'

শ্রীলেখা দেবীর ম্লান বিষণ্ণ মুখে একটু যেন রক্তের ছোপ লাগল, বললেন, 'বাঃ আমি আবার কেমন করছি। কমলাক্ষবাবুর মার অবস্থা ভালো নয়। টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি কলকাতা চললেন। সেই খবর দিতে এসেছিলেন।'

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন স্মরজিৎবাবু, 'ও! কি অসুখ তার?'

শ্রীলেখা বললেন, 'ক্যানসার, অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন।

স্মরজিৎবাবু নির্লিপ্ত উদাসীন ভঙ্গিতে বললেন, 'তাহলে বোধ হয়

আর আশা নেই। কমলাক্ষবাবুর যখন মা, তখন বয়সও বোধ হয় নিতান্ত কম হবে না।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন, 'বছর পঞ্চান্নর মত হবে বললেন।'

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'ও'। তারপর ছবির তৃতীয় অ্যালবামখানা টেনে নিতে নিতে বললেন, 'এইগুলি একেবারে শেষের দিকের। মাত্র মাস কয়েকের ভিতরে আঁকা।' ছবি দেখবার তেমন আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আশ্চর্য, কখন টেলিগ্রাম পেলেন কমলাক্ষবাবু, কখনই বা যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করলেন। ব্যাঙ্কে থেকেও তো আমরা কিছুই জানতে পারি নি। আর সেই কথা শ্রীলেখা দেবীকে জানাবার জন্য কমলাক্ষবাবু এই পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। তাঁর মার অসুখের খবর পেয়ে অবিলম্বে কলকাতা যাত্রাটা যেমন তাঁর পক্ষে জরুরী, শ্রীলেখা দেবীকে সে কথা জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়াটাও কি তাঁর পক্ষে তেমনি অপরিহার্য প্রয়োজন? হয়তো মার অসুখের খবরে খুবই বিচলিত হয়েছেন কমলাক্ষবাবু, হয়তো এই জব্বলপুর শহরে তাঁর আর কোন বান্ধবী নেই, যাঁর কাছ থেকে আশ্বাস এবং সান্ত্বনা পেতে পারেন, যাঁর সঙ্গে গভীর প্রীতি আর শ্রদ্ধার সম্পর্ক আছে। রোগ শোকের খবরে মানুষ বিচলিত হ'লে বন্ধুর চেয়ে হয়তো বান্ধবী কি আত্মীয়াকেই বেশি আপন মনে করে। স্মরজিৎবাবু তাড়া দিয়ে বললেন, 'কই, ভাবছেন কি, আসুন। ছবি দেখে চূড়ান্ত বোরডমে পৌছাবার আগে আপনাকে ছাড়ছি না।'

শ্রীলেখা দেবী হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত আর অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, সে ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু চূড়ান্ত বোরডমে কখন মানুষ পৌছে সে সম্বন্ধেই কেবল তোমার ধারণা নেই।'

স্মরজিৎবাবু বিস্মিত হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তার পর অদ্ভুত একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু তুমি অত বিচলিত হ'চ্ছ কেন লেখা,

কলকাতায় ডাক্তার কবিরাজের তো অভাব নেই, তা ছাড়া কমলাক্ষ-বাবুর মা তো বুড়োও হয়েছেন শুনলুম।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন, 'হলেনই বা বুড়ো, বুড়ো হ'লে তো আর কষ্ট মানুষের কম হয় না। আমার বাবাও বুড়ো বয়সেই মারা গেছেন ; কি কষ্ট যে তিনি পেয়েছেন তা তোমার মনে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে।'

বললুম, 'কি হয়েছিল আপনার বাবার!'

শ্রীলেখা দেবী বললেন, 'ওই ক্যানসার।'

বললুম 'ও'!

স্মরজিৎবাবু অত্যন্ত তরল ভঙ্গিতে হাসলেন, 'আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন। তিন বছর আগে লেখার বাবা মারা গেছেন ক্যানসারে. আবার তিন বছর পরে কমলাক্ষবাবুর মাও মারা যেতে বসেছেন, আর সেও ক্যানসারে। কিন্তু এর মাঝখানে আরো কতজনের বাবা আর মা যে ওই রোগে মারা গেছেন, লেখা, সে হিসাব তুমিও রাখো না, আমিও রাখি না।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন, 'তুমি যদি সত্যি সত্যি ডাক্তার হ'তে তাহলে রাখতে। মানুষের রোগ শোকে অমন সিনিক হয়ে থাকতে পারতে না।'

মৃদু হেসে স্মরজিৎবাবু অ্যালবামটি বন্ধ করলেন, তারপর দেশলাইর কাঠি জ্বেলে চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'ডাক্তার বলেই তোমার মত সেণ্টিমেণ্টাল হতে পারিনে লেখা। রোগকে আমরা শরীরের একটা অবস্থা বলেই মনে করি, মৃত্যুকেও তাই।'

শ্রীলেখা দেবী উত্তেজিত স্বরে বললেন, কিন্তু সত্যিকারের যাঁরা চিকিৎসক তাঁরা তা মনে করেন না। রোগকে, মৃত্যুকে দেহের একটা সাধারণ অবস্থা বলে ভাবেন না তাঁরা। রোগের সঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গে তাঁরা প্রাণপণ যুদ্ধ করেন, দায়িত্ব ভুলে পালান না একটি ছবির

কাছে কতব্যকে বিসর্জন দেন না।' শ্রীলেখা দেবী বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমি হতবাক হয়ে রইলাম। স্মরজিৎবাবুর গম্ভীর মুখে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল। কেমন যেন একটু ক্লিষ্ট আর ক্লান্ত দেখাল তাঁর মুখ। কিন্তু পরক্ষণেই হাসির আড়ালে সেই ক্লেশ আর ক্লান্তিকে ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করলেন স্মরজিৎবাবু, বললেন, 'ঘাবড়াবেন না, সামান্য একটু দাম্পত্য ঝটিকা। যাঁরা এতে অভ্যস্ত তাঁদের কাছে টীকা-টীপ্পনির প্রয়োজন হয় না, আর যাঁরা অনভ্যস্ত আর অরসিক টীকা-টীপ্পনি তাঁদের কাছে করে লাভ নেই।'

আমি জবাবের অভাবে শুধু একটু হাসলাম। অ্যালবাম থেকে ছবি দেখাবার উৎসাহ কিন্তু স্মরজিৎবাবুর আর দেখা গেল না, তিনি খবরের কাগজের একটি সাদা জায়গায় পেনসিল দিয়ে অনমনস্ক ভাবে একটি মুখ আঁকতে লাগলেন।

খানিক বাদে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন শ্রীলেখা দেবী। একটু আগেকার উত্তেজনার কোন চিহ্ন আর নেই। স্নিগ্ধ স্ফীত সৌন্দর্যে সমস্ত মুখখানা কোমল আর রমণীয়। বললেন, 'বাঃ, চুপচাপ এমন করে বসে রয়েছেন যে।'

হেসে বললুম, 'কি আর করি।'

স্বামীর দিকে তাকালেন শ্রীলেখা দেবী, সস্নেহে প্রশ্রয়ের সুরে বললেন তুমি বুঝি আবার ছবি আঁকতে বসলে।'

স্মরজিৎবাবু আমার ভাষার এবং প্রায় থামার ভঙ্গিতে জবাব ছিলেন, 'কি আর করি।'

শ্রীলেখা দেবী মৃদু হেসে দু'কাপ চা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। চায়ে একটু চুমুক দিয়েই বাকি দু' একটা টানে স্মরজিৎবাবু শেষ করে ফেললেন তাঁর স্কেচ। তারপর স্ত্রীর দিকে কাগজখানা এগিয়ে ধরে বললেন, 'দেখতো চেনা যায় নাকি। দেখুন না অঞ্জনবাবু।'

কিন্তু স্মরজিৎবাবুর স্কেচ দেখবার আগে শ্রীলেখা দেবীর মুখের দিকে আমার চোখ পড়ল সুগৌর সুন্দর মুখখানি কেন জানিনা হঠাৎ আরক্তিম হয়ে উঠেছে। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে নিলেন শ্রীলেখা দেবী। স্কেচখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন।'

বললুম, 'বাঃ এতো দিব্যি কমলাক্ষবাবুর মুখ এঁকে ফেলেছেন ডাক্তারবাবু।'

স্মরজিৎবাবু হেসে বললেন, 'তাই নাকি। বলেন কি মশাই! আমি তো আপনার মুখ আঁকতে চেয়েছিলাম।'

স্মৃরজিৎবাবুর রসিকতাটা উপভোগ করে বললুম তাহলে এবার নিজের মুখ আঁকতে চেষ্টা করে দেখুন, বোধহয় আমার মুখ আঁকতে পারবেন।' একটু থেমে বললুম, 'সত্যিই স্কেচটুকু কিন্তু বেশ হয়েছে। সুন্দর মুখে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের ছাপ দু'একটি টানে বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। এ বোধ হয় খানিক আগে যখন মার অসুখের খবর পেয়েছেন কমলাক্ষবাবু তাঁর তখনকার মুখ।' শ্রীলেখা দেবীর পানে চেয়ে বললুম, বোধ হয় সত্যিই কমলাক্ষবাবু খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন মিসেস মুখার্জী। না হলে হয়তো ওপরে এসে ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতেন।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন, 'বিচলিত হয়েছিলেন বৈ কি। এতো আর রোগীর অসুখের খবর আসেনি ডাক্তারের কাছে, ছেলের কাছে মার মৃত্যুশয্যার ডাক এসে পৌঁচেছে।'

পর্দাটা একটু সরিয়ে মুখ বাড়াল মারাঠি ঝি রঞ্জা—'মাইজী!' শ্রীলেখা দেবী একটু হাসলেন, 'ওই যে আমারও ডাক এসে পড়েছে অঞ্জনবাবু। আপনারা বসে বসে মুখ আঁকুন আর মুখ দেখুন। আমি ওদিকটা সেরে আসি।' বললুম,'আচ্ছা, দেরী করবেন না কিন্তু বেশীক্ষণ।'

শ্রীলেখা দেবী ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানতে লাগলেন স্মরজিৎবাবু, তারপর হঠাৎ বললেন, 'কিছু মনে করবেন না অঞ্জনবাবু। রোগ, রোগী, চিকিৎসা সব মিলে কেমন যেন একটা বাতিকের মত হবার যো হয়েছে শ্রীলেখার। ওর বাবাও প্রায় এই রকমই ছিলেন।'

একটু কৌতূহলী হয়ে বললুম, 'তাই নাকি ? কি করতেন আপনার শ্বশুরমশাই ?'

স্মরজিৎবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তিনি আমার বাবার কম্পাউণ্ডার ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা বিদ্যায় আগ্রহ আর ঔৎসুক্য কোন ডাক্তারের চেয়ে তাঁর কম ছিল না।' স্মরজিৎবাবু একটু হাসলেন, 'বহুবার প্রেসক্রিপসনের ওপর তিনি নিজের বিদ্যা জাহির করতে গেছেন, আর বকুনি খেয়েছেন বাবার কাছে।'

বললুম, 'বলেন কি ! বেয়াই হওয়ার পরেও !'

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'না, বেয়াই হওয়ার পরে তাঁর চাকরি গিয়েছিল। দুজনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি ছিল না।'

বললুম, 'রীতিমত রোমাণ্টিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে যেন স্মরজিৎবাবু। ডাক্তারের ছেলে আর কম্পাউণ্ডারের মেয়ের সংমিশ্রণটা কি তা'হলে নিছকই কন্দর্প কম্পাউণ্ডারের কীর্তি, প্রজাপতি ঠাকুরের নয় ?'

স্মরজিৎবাবু ধমকের সুরে বললেন, 'আপনার দুঃসাহসটাতো বড় বেশী অঞ্জনবাবু। ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসে তার জীবনের অন্দর-মহলের দিকে উঁকি ঝুঁকি শুরু করছেন।'

বললুম, 'হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছি। অপরাধ অস্বীকার করি কি করে। হয় আমার চোখ বাঁধুন, আর না হয় একেবারে বাড়ির বের করে দিন।'

স্মরজিৎবাবু হেসে বললেন, 'সেই ভালো। আপনার মত মানুষকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রাখা নিরাপদ নয়। চলুন একবার সদর দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সদর দোর ছেড়ে আমার পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত এলেন স্মরজিৎবাবু। একটা তিনকোণী পার্ক দেখা যাচ্ছিল সামনে। স্মরজিৎ-বাবু বললেন, 'আসুন, বসা যাক খানিকক্ষণ। হ্যাঁ, এবার আপনি চোখ খুলতে পারেন।' হেসে বললুম, 'কিন্তু চোখ খুললেই কি দোর খুলবেন?'

স্মরজিৎবাবু বললেন, 'বাঃ, অমন বাঁকা চোখ কেন আপনার, অত লুব্ধ অভদ্র কেন। কেবল গৃহস্থের দোরের ফাঁক দিয়েই তাকাবেন, কেন বাইরে কি কিছুই দেখবার নেই? আকাশের গায়ে মেঘ দেখুন, পাহাড় দেখুন মেঘের মত।'

বললুম, 'আমি আপনার মত শিল্পীও নই, কবিও নই ডাক্তারবাবু। প্রকৃতি আমাকে মোটেই টানে না।'

স্মরজিৎবাবু একটু হাসলেন—'তা বুঝতে পেরেছি অঞ্জনবাবু। এখনো কেবল নারী প্রকৃতির টানেই ভেসে চলেছেন। ভেবেছেন নারী নিজেই তো একখানি পুরো প্রকৃতি। তার মধ্যে মেঘ আছে, বিদ্যুৎ আছে, উদ্যান আছে, অরণ্য আছে, সমুদ্র আছে, সরোবর আছে, আলাদা প্রকৃতি দিয়ে আর হবে কি? একদিন আমিও তাই ভেবেছিলাম, আমিও ওই রকম করেই শুরু করেছিলাম।'

বললুম, 'তারপর? শেষ করলেন কি দিয়ে!'

স্মরজিৎবাবু হেসে বললেন, 'আপনি তো মশাই মহা বেরসিক। শুরুটা ভালো করে না শুনেই শেষের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছেন! শেষের কথা এখনো বলবার সময় আসেনি অঞ্জনবাবু।'

চার

জব্বলপুর ব্রাঞ্চে আমি বছরখানেক ছিলাম। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, অফিসের মধ্যে দুটি দল আছে। একটি দল ম্যানেজারের আর একটি দল এক্াউন্টেণ্টের। প্রথম দলে বাদল, নিরুপমবাবু, তেওয়ারী। দ্বিতীয় দলে বিল ডিপার্টমেণ্টের প্রমথবাবু, মণিময় সেন, ক্যাশিআর গর্গ এবং আরও কয়েকজন। আমি প্রথম প্রথম নিরপেক্ষ থাকতেই চেষ্টা করেছিলাম, তারপর কি করে যে এক নম্বর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম তা নিজেই টের পেলাম না। বাদলকে আমার ভালো লাগল তার তারুণ্য আর উদ্দামতার জন্যে। নিরুপমবাবুকে ভালো লাগলো তাঁর বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের জন্যে। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর ডায়েরি পড়তে দিতেন। তাতে বেশির ভাগই জীবনদর্শনের কথা থাকত। আমি আমার স্ত্রীর লেখা চিঠি এবং স্ত্রীকে লেখা চিঠির কোন কোন অংশ তাঁকে পড়ে শোনাতাম। বাদলের কাছে প্রথমদিন স্বীকার না করলেও আমি যে বিবাহিত একথা তাঁর কাছে গোপন করিনি। সেই সব চিঠিপত্রের বিরহ বেদনা নিয়ে নিরুপমবাবু মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাশা করতেন। এমনি করেই ওঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

অফিসে কাজের পর আমরা তিনজনে একসঙ্গে ঘুরি, একসঙ্গে বেড়াই। কোনদিন যাই খামারিয়ার দিকে, কোনদিন কাণ্টনমেণ্টে। তারপর একটা ছুটির দিন দেখে নর্মদা ফল্স্ দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রমথবাবুদেরও আমরা সঙ্গে ডেকেছিলাম। কিন্তু ওঁরা কেউ এলেন না। প্রমথবাবুর মাথা ধরল, নীলকান্তবাবু স্টেটমেণ্ট

মেলাতে বসলেন, মণিময়ের অন্য কি একটা দরকারী কাজ পড়ল। ফলে আমরা তিনজনেই গেলাম। আর মনে মনে তাই আমরা চেয়েছিলাম। ভেরিঘাট পর্যন্ত ছোট ট্রেনে গিয়ে পাহাড়ীপথ ভাঙতে ভাঙতে আমরা হাজির হলাম নর্মদা-প্রপাতের ধারে। সারাদিন কাটালাম। আতিথ্য নিলাম স্থানীয় এক পাণ্ডার ঘরে। বাদল তাকে জিজ্ঞাসা করল, যে জায়গাটা ঝিলের মত সেখানে বেড়াবার জন্যে নৌকো আর নারী মেলে কিনা। পাণ্ডার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে করতে বাদল প্রায় মার খায় আর কি! আমরা পাণ্ডা মশায়কে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। তাঁর ঘরে তরুণী স্ত্রী আছে। বাদল তাকে কটাক্ষ করেই কি যেন একটা বলেছিল।

কিন্তু আমাদের সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সেই দুরূহ অভিযানের কাহিনী এখন থাকুক। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানে স্মরজিৎবাবুর কথাটাই আগে বলে নিই। স্মরজিৎ-কমলাক্ষ-শ্রীলেখার ত্রিকোণ কাহিনী।

বেড়াতে বেড়াতে বাদল আর নিরুপমবাবুর মুখে অনেক কথাই শুনলাম।

ওঁরা তিনজনে নাকি মাসে দু'একবার, কখনো বা আরো বেশি এই প্রপাতের ধারে বেড়াতে আসেন। অবশ্য আমাদের মত এত কষ্ট করে ওঁদের আসতে হয় না। নিজের গাড়ি আছে ডাক্তারবাবুর। অনেকখানি পথ তাতেই আসতে পারেন। তারপর সে গাড়ি ড্রাইভারের জিম্মায় রেখে নিজেরা হাঁটেন। খেয়ে দেয়ে স্মরজিৎবাবু একধারে বসে স্কেচ করেন। খানিকটা দূরে বসে কমলাক্ষ আর শ্রীলেখা শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ না করে মৃদুস্বরে গল্প করেন।

শুক্লপক্ষের রাত হলে দুই পাহাড়ের মাঝখানে নদী যেখানে শান্ত ঝিলের রূপ নিয়েছে সেখানে তাঁরা নৌকো করে বেড়ান। কমলাক্ষবাবু নাকি নিজেও বেশ নৌকো চালাতে পারেন। তাঁর বৈঠার ছোট ছোট

আঘাতে ঝিলের বুক চঞ্চল হয়ে ওঠে। দুইদিকে শ্বেত পাহাড়ের মুগ্ধ প্রতিবিম্ব ভেঙে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কমলাক্ষবাবু ভালো আবৃত্তি করতে জানেন। স্মরজিৎ কি শ্রীলেখার অনুরোধে তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করেও শোনান।

তাঁদের এই ঘনিষ্ঠতার কথা শহরের অনেকেই নাকি এখন জানে। বাঙালী সমাজের মধ্যে এ নিয়ে নাকি কিছু আলাপ আলোচনাও হয়। কিন্তু স্মরজিৎবাবুর আর্থিক অবস্থা এত সচ্ছল যে ডাক্তার হয়েও ডাক্তারি না করে ছবি আঁকবার খেয়াল যেমন তিনি বজায় রাখতে পারেন, তেমনি পারেন মধ্যবিত্ত সমাজের রীতিনীতিকে উপেক্ষা করতে, ডাক্তার হিসাবে ছাড়া তাদের অন্য কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে। তিনি যে সামান্য কয়েকটি ইঙ্গ-বঙ্গ কি ইঙ্গ-মারাঠি পরিবারের সঙ্গে মেশেন সেখানে এ ধরনের মেলামেশার প্রচলন আছে। সেখানে এসব নিয়ে কোন কথা হয় না, অন্তত প্রকাশ্যে নয়।

বাদল বলল—'জানেন অঞ্জনদা, দেখে শুনে আমাদের নীলকান্ত-বাবু হিংসেয় জ্বলে। তার সঙ্গেও বহু মারাঠি, হিন্দুস্থানী কি বাঙালী পরিবারের আলাপ আছে। কিন্তু সে আলাপে [illegible] লাইফ-ইনসিওরেন্সের দু একটা ক্লাএন্ট বাগানো যায়। তা-ও বড় জোর দেড় হাজার আড়াই হাজারের পলিসি। কি ব্যাঙ্কে দু'চারটা কারেন্ট কি ফিক্সড ডিপজিট একাউন্ট বাড়িয়ে কোম্পানির কাছে ক্রেডিট নেওয়া। ওই মর্কট চেহারায় এর চেয়ে বেশি কি আর হবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোকটা জ্বলে পুড়ে মরে। শুনেছি তলে তলে নাকি হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠায়। কার চাল-চলন কি রকম, কে কি কাজ করে না করে—সব রিপোর্টেড হয়।'

নিরুপমবাবু একটু ধমক দিয়ে বলেছিলেন—'আঃ থামো! এমন চমৎকার জায়গায় এসেও তুমি পরনিন্দা-পরচর্চা ছাড়তে পারলে না?'

বাদল বলল—'পরের নিন্দা কিন্তু পরস্ত্রীর বন্দনা। মিসেস্ মুখার্জীর মত অমন একজন গ্র্যাণ্ড লেডী আমি আর দেখিনি। কমলাক্ষবাবুর নামে ফোন টোন এলে আমি মাঝে মাঝে ধরি। আঃ কি গলা! ম্যানেজারের হুকুমে মাঝে মাঝে পাস-বই চেক-বইটা পৌঁছে দিয়ে আসি। তিনি খুশি হয়ে হাসেন। কোন কোন দিন গোলাপফুলের তোড়া বেঁধে এনে দেন। আমি জানি আমি শুধু বাহক মাত্র। তবু সেই হাসির তোড়া, ফুলের তোড়া বহন করেও সুখ।'

নিরুপমবাবু হতাশার ভঙ্গি করে বলেন—'একেবারে পেকে গেছে।'

সেদিন ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। আস্তানায় এসে শুনি রান্নাঘরে গোলমাল, আহারের ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ। গঙ্গাবাঈ আজ আর আসেনি। বাবুরা যাঁর যাঁর নিজের রুটি নিজে তৈরি করে খাবেন। একথা শুনে কেউ কেউ হোটেলে চলে গেছে। কেউ বা দই আর প্যাঁড়া এনে ফলারের ব্যবস্থা করেছে।

খবর নিয়ে জানা গেল গঙ্গাবাঈ নাকি মাতাল ছেলের হাতে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বেশি টাকা চেয়ে না পেয়ে বউকে মেরেছে, মাকেও রেহাই দেয়নি। বউয়ের মার ঠেকাতে গিয়ে মা-ই মার খেয়েছে বেশি।

বাদল শুনে প্রায় ক্ষেপে উঠল—'কি হতভাগা পাষণ্ড তাই দেখুন। ঘরে অমন সুন্দরী বউ, তা ছেড়ে ও মদ খাবে, আর যেখানে সেখানে যাবে আর গুণ্ডামি করবে। মাঝে মাঝে আমার কি ইচ্ছে করে জানেন? ওর বউকে ইলোপ করে নিয়ে চলে যাই।'

এত দুঃখের কাহিনীর মধ্যেও বাদলের কথা শুনে আমরা সবাই

হেসে উঠলাম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম নীলকান্তবাবু হাসলেন না। তিনি বাদলের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন—'আপনারা তো তাই করবেন, আপনারা সব ওইভাবেই পরস্ত্রীর দুঃখ দূর করবেন।'

আমার মনে হল ম্যানেজারের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। তিনি একবার চোখ তুলে একাউণ্টেণ্টের দিকে তাকালেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে একটু হেসেই বললেন—'নীলকান্তবাবু, এটা অফিস রুম নয়, অফিস আওআর্সও নয়, মেসের রান্নাঘর। এখানেও কি আপনি অফিসার হয়ে ওদের ওপর চোখ রাঙাবেন?'

নীলকান্তবাবু বললেন—'চোখ রাঙারাঙির কি আছে। ওসব অশ্লীল হাসি-ঠাট্টা আপনি সহ্য করতে পারেন, আপনি প্রশ্রয় দিতে পারেন, আমি পারব না।' তিনি রান্নাঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন। সে রাত্রে আর জলস্পর্শ করলেন না।

বাদল ফিসফিস করে বলল—'আজ রাত্রে ফের একখানা লম্বা চিঠি যাবে।'

কিন্তু আমাদের সেই অফিস ক্লিক, রেষারেষি, উপদেশীয় সংঘাত সংঘর্ষের কাহিনী এখন বলব না। শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি সে-যুদ্ধে নীলকান্তবাবুরই জয় হয়েছিল। মাস ছয়েকের মধ্যে বাদল বদলি হল মীরাটে, নিরুপমবাবু এলাহাবাদে আর আমি এক বছর বাদে হেড অফিসেই ফিরে এলাম। ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

সৈন্যসামন্ত হারিয়ে কমলাক্ষবাবু আরো কিছুদিন ছিলেন। একাউণ্টেণ্টের সঙ্গে গোপন সংঘর্ষে তিনি সহজে হার মানেননি। কারণ শহরে জনপ্রিয়তা তাঁরও কম ছিল না। আর কাজকর্মে তাঁর দক্ষতার কথাও কোম্পানি জানতেন। তাই সহজে তাঁকে অপদস্থ করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও হারতে হ'ল, হারাতে হল তার চেয়েও বেশি।

আমরা পায়ে হেঁটে নর্মদায় গিয়েছি শুনে ডাক্তারবাবু সেদিন ফোনে আমাকে একটু গঞ্জনা দিলেন—'যাবেন, আমাকে বললেন না কেন ? আমরাও তো সঙ্গী হতে পারতাম। না কি আমরা তার যোগ্য নই ?'

আমি বললাম—'কি যে বলেন। ভাবলাম আপনাকে ডিস্টার্ব করা হবে।'

ডাক্তারবাবু বললেন—'মোটেই না। মোটেই না। ফলস্ আর মারবেল রক আমার খুব প্রিয় জায়গা। আমি অনেকবার গাইডের কাজ করেছি জানেন ? শুধু নতুন সঙ্গীকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব এই লোভে। আপনি আসুন। আপনি কেমন দেখলেন সব শুনব, আমি কেমন দেখেছি তাও শোনাব।'

এরপর শ্রীলেখা দেবী ফোন ধরলেন—'আমাদের ফেলে খুব যে বেড়িয়ে এলেন ?'

'আপনারা তো অনেকবার বেড়িয়েছেন।'

তিনি বললেন, 'তাতে কি। আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে। সব শোনা যাবে। আপনার নিমন্ত্রণের কথা ভুলে গেলেন নাকি ?'

'ভুলব কেন ?'

'তাহলে কালই সন্ধ্যার পর চলে আসুন।'

আমার মত সামান্য একজন কর্মচারীর পক্ষে এ ধরনের আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ অপ্রত্যাশিত। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হল। কমলাক্ষবাবুর নিমন্ত্রণ তো বাঁধাই আছে। আমরা একসঙ্গে যাব এই কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ সকালে নাগপুরের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ট্রাঙ্ক টেলিফোন পেয়ে কমলাক্ষবাবু পরদিন এগারটায় সেখানে রওনা হয়ে গেলেন।

আমি ভগ্নদূতের মত এই সংবাদ নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম।

খবরটা শুনে মিসেস মুখার্জীর মুখখানা একটু যেন ম্লান হয়ে গেল। আমার কল্পনাও হতে পারে। হতে পারে বাদল আর নিরুপমবাবু যেসব ঠাট্টা-তামাশা করেছিলেন তাতেই আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে।

মিসেস মুখার্জী বললেন—'আপনাদের ধরনই আলাদা। আপনারা হলেন সব কাজের লোক। আপনাদের কি আর কথা দিয়ে কথা রাখা পোষায়।'

এসব অনুযোগ যে কার সম্পর্কে তা আমার বুঝতে বাকি রইল না। দৃষ্টিভ্রম আর শ্রুতিভ্রম—একই সঙ্গে কি দুই বিভ্রমই ঘটল।

স্মরজিৎবাবু কোন রকম মন্তব্য না করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তাঁর প্রথম বয়সের আঁকা অনেক ছবি পর পর দেখালেন। দেখলাম স্ত্রীকে নিয়েও কম ছবি আঁকেননি। শ্রীলেখা দেবীর নানা অবস্থার নানা ভঙ্গিমার সব ছবি। ভদ্রলোক স্ত্রীকে যে খুব ভালো-বাসেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন একনিষ্ঠা খুব কম দেখা যায়। দ্বিতীয় নারীমূর্তি প্রায় নেই। আর আছে বুড়ো-বুড়ী, ডিসপেন্সারীর রোগী-রোগিণীদের নানা ধরনের স্কেচ, কি গাঢ় রঙের তুলিতে নিসর্গ বর্ণনা।

কথায় কথায় বললেন কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ৣতে পড়তে দু' একজন আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে ভাব হয়। তাঁদের সঙ্গে বাজি রেখে মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন স্মরজিৎবাবু। কিন্তু তাঁর সেই অপটু অশিক্ষিত হাতের আঁকা ছবিও শিল্পী বন্ধু এমন কি তাঁদের গুরু শিক্ষকদের মহলে সুখ্যাতি পায়। এমনি করে নেশাটা তাঁকে পাকাপাকি ভাবে পেয়ে বসে।

আমি বললাম—'এতই যখন আপনার ঝোঁক পুরো আর্টিস্ট না হয়ে আধা আর্টিস্ট হয়ে রইলেন কেন? শিল্পের দেবতাকে কেন হৃদয়ের সবখানি দিলেন না?'

স্মরজিৎবাবু হেসে বললেন—'বড় শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। সে এক বিরাট ইতিহাস!'

মিসেস মুখার্জী আমাদের খাদ্য পানীয় দিয়ে একটু কাজ আছে বলে হেসে বিদায় নিয়েছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন তিনি থাকলে নাকি আমাদের শিল্প-সাহিত্য আলোচনায় ব্যাঘাতই হবে। আমাকে প্রতিবাদ করবার সময় দেননি।

সেদিন শ্রীলেখা দেবী আমাদের সান্নিধ্যে ছিলেন না। স্মরজিৎবাবু তাঁর স্ত্রীর ছবি দেখিয়ে আর গল্প করেই অনেকটা পুষিয়ে দিলেন।

স্মরজিৎবাবুরা জব্বলপুরে দু'পুরুষ ধরে ডাক্তার। ওঁর বাবা বিশ্বজিৎবাবু এখানে এসেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে। তখন শহরে বাঙালীর সংখ্যা সামান্য ছিল। ডাক্তারের সংখ্যা ছিল দু'চার জন। বছর দশেকের মধ্যে পসারে প্রতিপত্তিতে বিশ্বজিৎবাবু সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন। বাড়ি করলেন, গাড়ি করলেন, বাগান আর জায়গা-জমি করলেন। বললেন—'ছেলেকে বিলাত পাঠাব, সেখান থেকে ডাক্তারি পাস করে ফিরে আসুক স্মরজিৎ।' স্মরজিৎবাবুর মা বললেন—'পাস পরীক্ষা তো এ দেশেও আছে, যা করবার এখান থেকেই করুক, আমার একমাত্র ছেলেকে অত দূর দেশে আমি কিছুতেই পাঠাতে দেব না।'

বিদেশে যেতে স্মরজিৎবাবুরও যে তেমন খুব গরজ দেখা গেল তা নয়। দূরের সুর কানে এসে লাগলেও অতি নিকটের একজন প্রতিবেশিনীর কাঁকন-নিক্কনই তাঁর মরমে পৌঁচেছে। সে আর কেউ নয়; তাঁদেরই ভুবন কম্পাউণ্ডারের মেয়ে শ্রীলেখা। তাকে নিয়ে স্মরজিৎবাবু তখন কবিতা লিখছেন, খাতার পাতায় ছবি আঁকছেন তার মুখের, তাঁর সমস্ত শিল্পকলা আর কারুকার্য সেই চারু মুখের অলঙ্কার হিসাবেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁদের কম্পাউণ্ডার ভুবন

ভট্টাচার্য ছিলেন অদ্ভুত ধরনের মানুষ। দিন রাত প্রায় ডিস্‌পেন্‌-সারীতেই কাটাতেন। প্রেসক্রিপসন দেখে ওষুধ তৈরি করতেন, মাল ডেলিভারি নিয়ে নিজের হাতে সাজিয়ে রাখতেন তিন চারটে ওষুধের আলমারি। বিশ্বজিৎবাবুর অনুপস্থিতিতে নিজেই রোগীদের সঙ্গে কথা বলতেন, রোগের বিবরণ শুনতেন, পরামর্শ দিতেন ওষুধপথ্য সম্বন্ধে। ডিসপেন্‌সারিই ছিল তাঁর বাড়ি-ঘর, সমাজ-সংসার। শ্রীলেখা যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁর মা মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিতেন তাঁকে ডিসপেন্‌সারীতে—'যা ডেকে নিয়ে আয় দেখি, কেবল কি ওষুধের শিশি নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে। সংসারের আর কোন কিছু দেখতে হবে না।'

কিন্তু বাবাকে ডেকে ঠিক সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারত না শ্রীলেখা, উল্টে ভুবন ভট্টাচার্যই মেয়েকে ডেকে নিতেন কাজে—'রাখ তো মা কুইনাইনের ফাইলগুলি গুছিয়ে।' 'ওখান থেকে বার কর তো খানিকটা বরিক কটন।' 'একটু টিনচার আয়োডিন লাগিয়ে দে দেখি ছেলেটার পায়ে।'

ক্রমে শ্রীলেখাকেও যেন নেশায় পেয়ে গেল। ভালো লাগল ডিসপেন্‌সারীর গন্ধ, ডিসপেন্‌সারীর আবহাওয়া, রোগের বিবরণ, রোগীদের সাহচর্য।

ভুবন ভট্টাচার্যই বলতেন—'তুই যদি ছেলে হ'তিস বুড়ী, তোকে আমি ডাক্তারি পড়াতাম। নিজে তো কম্পাউণ্ডারী করেই জীবন কাটিয়ে দিলুম, তোকে বড় ডাক্তার করতুম।' শ্রীলেখা বলতেন—'কেন বাবা, মেয়ে হলে বুঝি ডাক্তার হওয়া যায় না। সেদিন প্রবাসীতে দেখলাম একজন মেয়ে ডাক্তারের ছবি, জার্মানী থেকে পাস করে এসেছেন। আমিও ডাক্তার হব বাবা।'

ভুবন ভট্টাচার্য হাসতেন—'হবেই তো। কিন্তু প্র্যাকটিসের ফিল্ড

হবে ঘরের মধ্যে। আচ্ছা, আচ্ছা, নামকরা বড় ডাক্তারের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। তাহলেই তো হবে। জামাইও যা, ছেলেও তা। ঘরে থেকে সাহায্য করবি স্বামীকে। তার নামডাকের সঙ্গে তোর নামডাকও ফেটে পড়বে। কার বে:—না অমুক ডাক্তারের বো! বেরুলে বত্রিশ টাকা ভিজিট, বাড়িতে ষোল টাকা। রোগীকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগ সারে, ওষুধের দরকার হয় না।'

বাপ মেয়ের আলাপ শুনে বিশ্বজিৎ হাসতেন। নিজের কাছে ডেকে নিতেন শ্রীলেখাকে, কোলের উপর চেপে ধরতেন মুখ। ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে আঙুল বোলাতেন। দু' দুটি মেয়ে তাঁর অল্প বয়সে মারা গেছে। তাদের স্থান দখল করেছে শ্রীলেখা। পিঠভরা চুলের মধ্যে আঙুল বোলাতে বোলাতে বিশ্বজিৎবাবু বলতেন—'আচ্ছা মা আচ্ছা, তোমার আর বিলেত জার্মানীতে গিয়ে দরকার নেই। আমার যেটুকু বিদ্যা আছে, সেটুকু তো তোমাকে দিয়ে যেতে পারব। তাহ'লেই হবে। আর যেমন করেই পারি পাসকরা বড় ডাক্তার জামাই আমরা আনবই। তারপর তার সঙ্গে কম্পিটিশনে লেগে যাব।' প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ তৈরি করতে করতে ভুবন কম্পাউণ্ডারের মনে মাঝে মাঝে দোলা লাগত —'এই পাসকরা বড় ডাক্তারটি কে?'

শ্রীলেখাকে ভারি স্নেহ করতেন বিশ্বজিৎবাবু। তখন জব্বলপুরে বাঙালী মেয়েদের জন্য কোন স্কুল ছিল না। অবসর মত নিজেই তাকে লেখাপড়া শেখাতেন। বড় বড় অ্যানাটমির বই খুলে ছবি দেখাতেন, দুরূহ দেহতত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন প্রাঞ্জল ভাষায়। বড় বড় ডাক্তারি বই পড়ে শোনাতেন। স্মরজিৎবাবু নিজেও তখন আই. এস. সি পাস করে কলকাতার মেডিকেল কলেজে ঢুকেছেন। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানটা মাথার মধ্যে ভাল করে ঢুকতে চাইছে না। অবশ্য সে কথা জানাবার সাহস নেই বাবাকে। বিশ্বজিৎবাবু মাসে মাসে প্রচুর টাকা

পাঠাচ্ছেন, রাজসিক আড়ম্বরে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। হোস্টেলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অনুরোধ করে গেছেন বিশেষ করে যাতে ছেলের কোন রকম অসুবিধা অস্বাচ্ছন্দ্য না ঘটে। আর প্রতি চিঠিতে উপদেশ দিচ্ছেন ছেলেকে—'মনে রেখ বড় হওয়া চাই।' বড় হওয়া মানে বড় ডাক্তার হওয়া 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ'-এর চেয়ে বড় কাম্য যেন আর বিশ্বজিৎবাবুর ছিল না।

বছর তিন চার কাটল এমনি করে। খোঁজ খবর চলতে লাগল শ্রীলেখার সম্বন্ধের। ফ্যান্সি স্টলের প্রোপ্রাইটর তাঁর বি-এ পাস ছেলের জন্য উপযাচক হয়ে চাইলেন শ্রীলেখাকে। কিন্তু বিশ্বজিৎবাবু বললেন, 'আমার মার কাছে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি মশাই, আমার চেয়েও বড় ডাক্তার তাকে এনে দিতে হবে। এখন ডাক্তার পাই কোথায় বলুন দেখি। এদিকে ভুবন তো ওষুধের আলমারির আড়ালে বেশ লুকিয়ে আছে। কন্যাদায়টি তুলে দিয়েছে আমার ঘাড়ে। দেখতে অমন হলে কি হবে, ভারি চালাক মানুষ, মিটমিটে শয়তান। ভেবেছে যা তা একটা সম্বন্ধ তো আর করে ফেলতে পারব না। এ তো কেবল ভুবন কম্পাউণ্ডারের মেয়ে নয়, বিশ্বজিৎ ডাক্তারের আদরিনী।'

ডাক্তার পাত্রের খোঁজখবর নিচ্ছেন বিশ্বজিৎবাবু। ও । মাঝে মাঝে বন্ধুদের কাছে চিঠিপত্র লিখছেন দিল্লীতে, কলকাতায়। কিন্তু ঠিক পছন্দমত সম্বন্ধ জুটছে না। কেবল ডাক্তার হলেই তো হবে না, স্বাস্থ্য, চেহারা, বংশ সবই তো দেখতে হবে। এদিকে পাত্রপক্ষেরও খুঁতখুঁতি আছে। পরমাসুন্দরী হলে হবে কি, মেয়ে তো এক কম্পাউণ্ডারের, তাছাড়া অত দূরদেশে শ্বশুরবাড়ি করে লাভ কি।

বন্ধুদের ভিতর ঠাট্টা করে কেউ কেউ বলতো—'তোমার ইচ্ছাটা কি বল তো ডাক্তার? ভুবনের মেয়েকে শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরেই রাখতে চাও নাকি বিশু?

বিশ্বজিৎবাবু ধমক দিয়ে উঠতেন—'ছিঃ, কথাটা তোমরা বললে কি করে হে? ছেলেবেলা থেকে ভাইবোনের মত মানুষ হয়েছে না ওরা? বুড়ীকে কি আমি মেয়ের চেয়ে একটুও আলাদা চোখে দেখি?'

পুজোর ছুটিতে স্মরজিৎবাবু বাড়ি গেলেন কলকাতা থেকে। তিন চার বছরের মধ্যে তিনি খুব কমই থেকেছেন জব্বলপুরে। এদিক থেকে খুব কড়া ছিলেন বিশ্বজিৎবাবু। ছাত্রেরা ছুটিতে বাড়ি এলে আর যাই করুক, পড়াশোনাটা করে না, পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরেই সময় কাটায়। পড়াশোনার পক্ষে প্রবাসের ছাত্রাবাসই সবচেয়ে ভালো।

জব্বলপুর এসে স্মরজিৎবাবু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলেন। গল্পগুজব, আমোদ-প্রমোদে একটানা কাটতে লাগল কয়েকদিন। বাবাকে দেখলে বই নিয়ে বসেন, আর তিনি যখন কলে বেরিয়ে যান, খিড়কি দোর দিয়ে পা টিপে টিপে বের হন স্মরজিৎবাবুও। মা মুখ টিপে টিপে হাসেন। একদিন তিনি বললেন—'কেবল বন্ধুদের নিয়েই কাটাচ্ছিস। চল একদিন ঘুরে আসি নর্মদা ফল্‌স্‌ থেকে, অনেকদিন যাইনি।'

দেখে দেখে নর্মদা ফল্‌স্‌ তখন পুরনো হয়ে গেছে স্মরজিৎবাবুর কাছে। কোন চার্ম নেই আর তার মধ্যে। স্মরজিৎবাবু মুখ বাঁকিয়ে বললেন—'ফল্‌স্‌? আচ্ছা চলো।'

স্মরজিৎবাবুর মার সঙ্গে গেলেন ভুবন কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী আর তাঁর মেয়ে শ্রীলেখা। বিশ্বজিৎবাবু যেতে রাজী হলেন না, তবে মোটরটা ছেড়ে দিলেন।

পাহাড়ে উঠে মেয়েরা স্বেচ্ছাবিচরণ শুরু করলেন। পুরনো, পরিচিত জায়গা, কতবার এসেছেন, গেছেন। স্মরজিৎবাবু বেরুলেন

বন্ধুর সন্ধানে। কারো যদি আসবার সুবুদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু কাউকেই পেলেন না। ঘুরে ঘুরে ফের এলেন জলপ্রপাতের কাছে। ভাবলেন স্নানটা সেরে নেওয়া যাক। তুমুল শব্দে জল পড়ছে নিচে। বড় প্রপাতটার পাশ কাটিয়ে গেলেন স্মরজিৎবাবু। স্নান করবার মত ছোট ছোট কয়েকটি ঝরনা আছে এখানে ওখানে। ভাবলেন তারই একটার তলায় গিয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু খানিকটা এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ালেন স্মরজিৎবাবু। সপ্তদশী একটি মেয়ে পিছন ফিরে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের ফুটো দিয়ে তিন চারটে ধারার জল পড়ছে তার গায়ে। পিঠভরা ভিজে চুল আষাঢ়ের মেঘের মত ছড়িয়ে রয়েছে। আর সেই মেঘ থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে জল। ভিজে শাড়ির ভিতর দিয়ে দেহের অপরূপ কোমল বর্ণ ফুটে বেরুচ্ছে। চলে যাওয়া উচিত ভেবেও সেখান থেকে যেতে পারলেন না স্মরজিৎবাবু। তাঁর নিঃশ্বাস আর হৃৎপিণ্ডের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। প্রপাতের তুমুল গর্জন ছাপিয়ে সে শব্দ শুধু তাঁর নিজেরই কানে এসে লাগছিল। মেয়েটির তা কানে যাওয়ার কথা নয়। তবু কেন যেন সে এদিকে মুখ ফেরাল। স্মরজিৎ দেখলেন শ্রীলেখা। শ্রীলেখা দেখলেন স্মরজিৎ দুজনেই চোখ নামালেন। তারপর শ্রীলেখা একপাশ দিয়ে অতি সঙ্কুচিতভাবে চলে গেলেন।

সঙ্কোচটা দুজনের মনেই লেগে রইল কয়েকদিন ধরে। স্মরজিৎবাবু ভাবলেন—এই মেয়েটিকেই কি তিনি ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছেন? স্মরজিতের তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। ঝরনার ধারায় যে স্নান করছিল সে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা, একই সঙ্গে অন্য এবং অনন্যা।

দিনকয়েক শ্রীলেখাও তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চললেন। কিন্তু

এড়াবার চেষ্টার মধ্যে দুজনের ধরা দেওয়ার চেষ্টাটাই যেন বেশি করে ধরা পড়তে লাগল।

একদিন বিশ্বজিৎবাবুর লাইব্রেরি খুলে কি একটা বই বের করে নিচ্ছেন শ্রীলেখা, স্মরজিৎবাবু ঢুকলেন সেই ঘরে, বললেন—'বাবা কোথায়?'

শ্রীলেখা আনত চোখে জবাব দিলেন—'কলে বেরিয়েছেন।'

'মা?'

শ্রীলেখা বললেন—'ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা পুজোয় বসেছেন।'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'আর সেই ফাঁকে তুমি বুঝি বই চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছ?'

শ্রীলেখা বললেন—'এমন চুরি আমি রোজই করি।'

স্মরজিৎ একটু হাসলেন—'কিন্তু ধরা তো আর রোজ পড় না। আজ পড়েছ। দেখি দেখি কি বই নিয়েছ?'

'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।'

'দেখি দেখি।'

বলেই বইসুদ্ধ হাতখানা শ্রীলেখার চেপে ধরলেন স্মরজিৎবাবু। এর আগে এমন কতবার তাঁদের ধরাধরি, কাড়াকাড়ি হয়েছে। কিন্তু স্মরজিৎবাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে শ্রীলেখার হাতখানা থরথর করে কেঁপে উঠল, আর সে শিহরণ স্মরজিৎবাবুর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল।

শ্রীলেখা মৃদুস্বরে বললেন—'ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে।'

'কেউ এসে পড়বে' কথাকটি ভারি মধুর শোনাল স্মরজিৎবাবুর কানে। তাহলে হাতখানি ধরেছে বলে কোন আপত্তি নেই শ্রীলেখার। কেউ এসে পড়বে বলেই আপত্তি। আরো মিনিট খানেক সেই হাত ধরে রইলেন স্মরজিৎবাবু, তারপর ছেড়ে দিলেন আস্তে আস্তে। কিন্তু সেই

লাবণ্য কোমল হাতখানির উত্তপ্ত স্পর্শ শুধু যেন কয়েকটি আঙুলেই নয়, স্মরজিতের সমস্ত সত্ত্বায় জড়িয়ে রইল।

ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার আর মাসকয়েক বাকি। ছেলে কেমন তৈরি হচ্ছে সে সম্বন্ধে অনেকদিন কোন খোঁজ খবর না পেয়ে বিশ্বজিৎবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। দিনের মধ্যে দুবার জিজ্ঞাসা করেছেন স্ত্রীকে—'খোকার কোন চিঠি পেলে ?'

স্মরজিৎবাবুর মা প্রতিবার জবাব দিচ্ছেন—'না গো না, পেলে তো বলতামই। তাই তো দিন দশেকের মধ্যে কোন চিঠিপত্র নেই—'

বিশ্বজিৎবাবু তখন আবার সান্ত্বনা দিচ্ছেন স্ত্রীকে—'চিঠিপত্র এখন অবশ্য ঘন ঘন না লেখাই ভালো। এখন অন্য কাজে সময় যত কম যায় ততই মঙ্গল। দাঁড়াও আমি ওদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রিপেড টেলিগ্রাম করে খবর নিচ্ছি।'

ডিসপেন্সারীতে গিয়ে বিশ্বজিৎবাবু কম্পাউণ্ডার ভুবন ভট্টাচার্যকে ডেকে বললেন—'একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম নিয়ে এসো তো ভট্টাচার্য। খোকাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে একটা টেলিগ্রাম করি। শরীর কেমন আছে, পড়াশুনো কেমন হল, কিছু যদি একটু জানাবে ছেলেটা। বোধহয় পরীক্ষা নিয়ে একেবারে মত্ত হয়ে আছে।'

ভুবন ভট্টাচার্য অবাক হয়ে বললেন—'আজ্ঞে, টেলিগ্রামের আবার দরকার কি ? কালই তো বিকেলে স্মরজিতের চিঠি এসেছে আমাদের বুড়ীর কাছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম কেমন আছে, কি লিখেছে ? বুড়ী বললে, ভালোই আছে বাবা। খবর যখন জানাই গেল, টেলিগ্রাম করে মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করবার দরকার কি।'

যে মিক্সচারের কাজটায় হাত দিয়েছিলেন ভুবন তাই নিয়ে ফের তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু বিশ্বজিৎবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন—'মিক্সচার এখন থাক। তুমি শোন। বুড়ীর কাছে সত্যিই চিঠি লিখেছে নাকি খোকা!'

বুড়ী মানে শ্রীলেখা। খোকা মানে স্মরজিৎ।

ভুবন বলল—'হ্যাঁ, প্রায়ই তো লেখে।' বিশ্বজিৎবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—'প্রায়ই লেখে! অথচ আমার কাছে তো কিচ্ছু লেখে না। প্রিপারেশন কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু জানায় না। এক কাজ করো ভুবন। তুমি ছুটে যাও দেখি বাড়িতে। বুড়ীর কাছে থেকে পোস্টকার্ড, খাম নিয়ে এস তো চেয়ে। পরীক্ষার কথা-টথা কিছু আছে নাকি দেখি।'

বিরক্ত হয়ে ভুবন কম্পাউণ্ডার মিক্সচার তৈরি ফেলে রেখে চটি জুতোর শব্দ তুলে দ্রুতপায়ে বাড়ি চলে গেলেন, তারপর মিনিট পনরো বাদে ফিরে এসে বললেন—'না চিঠিটা কিছুতেই দিল না বুড়ী। বলল চিঠি দিয়ে কি করবে। সে ভালো আছে, পড়াশুনো খুব করছে।'

তারপর কম্পাউণ্ডার একটু হেসে বললেন—'আমারই ভুল হয়েছিল ডাক্তারবাবু। পোস্টকার্ড নয়, বুড়ীর কাছে খামেই চিঠি লিখেছে স্মরজিৎ।'

বিশ্বজিৎবাবু হঠাৎ চমকে উঠলেন। খাম! একটু বাদে শান্ত আর গম্ভীর স্বরে বললেন—'পরীক্ষার আর কদিনই বা বাকি। বুড়ীর কাছে এত কথা কি আছে যে পোস্টকার্ড না লিখে এনভেলপ লিখতে হল তাকে। এত নষ্ট করবার মত সময় কোথায় পায় ও!'

ভুবন কম্পাউণ্ডার ততক্ষণে ফের মিক্সচারের শিশিতে মগ্ন হয়ে গেছেন।

বাড়ি ফিরে বিশ্বজিৎবাবু ডেকে পাঠালেন শ্রীলেখাকে। তাঁর সামনে দুরু দুরু বুকে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ালেন শ্রীলেখা।

বিশ্বজিৎবাবু বললেন—'তোমার কাছে নাকি চিঠি লিখেছে খোকা, দাও দেখি মা চিঠিখানা। পণ্ডিত কি লিখেছে একবার দেখি। কতদূর কি করল দেখি একবার। চিঠিখানা সঙ্গে আছে তো!'

শ্রীলেখা আরক্ত মুখে বলল—'না।'

বিশ্বজিৎবাবু বললেন—'তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন ক্রমেই কমে যাচ্ছে মা। এই বুদ্ধি নিয়ে ডাক্তারি বুঝবে কি করে বল দেখি? কতক্ষণ ধরে খুঁজছি চিঠিটা। আর তুমি আনতেই ভুলে গেলে। যাও তো এবার চট করে নিয়ে এসো দেখি।'

বিশ্বজিৎবাবুর কৃত্রিম বাৎসল্য আর সারল্যের সুরটি সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল শ্রীলেখা। একটু চুপ করে থেকে মাথা নিচু করেই জবাব দিল—'সে চিঠি আপনার দেখে কাজ নেই জ্যাঠামশাই, তা আমি আপনাকে দেখাতে পারব না।'

বিশ্বজিৎবাবু চিৎকার করে বললেন—'দেখাতে পারব না! একগুঁয়ে মেয়ে। আলবৎ পারবে! সে চিঠি আমাকে দেখাতেই হবে। কী আছে সে চিঠির মধ্যে!'

শ্রীলেখা তেমনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন—'সে কথা আপনার ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করবেন।'

বিশ্বজিৎবাবু কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বললেন—'বটে, আচ্ছা যাও তুমি। আমি তাকেই জিজ্ঞাসা করব।'

ডিসপেন্সারীতে গিয়ে বিশ্বজিৎবাবু ভুবন কম্পাউণ্ডারকে দিয়েই আনালেন টেলিগ্রামের ফর্ম। তারপর আর্জেণ্ট প্রিপেড টেলিগ্রামটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে না করে করলেন ছেলের নামে—'এমন কি চিঠি তুমি লিখেছ ভুবন কম্পাউণ্ডারের মেয়েকে যা আমি দেখতে পারিনে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে জানাও।'

স্মরজিৎবাবুর জবাব এল পরদিন, 'শ্রীলেখা আমার ভাবী স্ত্রী। তার কাছে লেখা আমার চিঠি আপনার পক্ষে দেখতে চাওয়াটা অশোভন এবং গর্হিত।'

ফের টেলিগ্রাম এল স্মরজিৎবাবুর কাছে—'অবিলম্বে রওনা হও।'

পরদিন ভোরের ট্রেনে স্মরজিৎ এসে উপস্থিত হলেন কলকাতা থেকে। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎবাবুর ছেলেকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন, তারপর শান্ত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার টেলিগ্রামের যে জবাব তুমি দিয়েছ জানো তার দায়িত্ব, জানো তার পরিণাম?'

স্মরজিৎ বললেন—'জানি।'

বিশ্বজিৎবাবু বললেন—'হয়তো তেমন করে জানো না। আমি আর একবার তোমাকে ভেবে দেখতে বলছি।'

স্মরজিৎ অবিচল স্বরে জবাব দিলেন—'ভেবে আমি দেখেছি। শ্রীলেখাকে বিয়ে আমায় করতেই হবে।'

বিশ্বজিৎবাবু একটু যেন চমকে উঠলেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'করতেই হবে? তুমি এতবড় নির্লজ্জ বদমাশ হয়েছ?'

স্মরজিৎ আরক্ত মুখে বললেন—'না, আপনি যা ভেবেছেন তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় আমি ওকে কথা দিয়েছি। আমার সেই কথার উপর ওঁরা সবাই নির্ভর করে রয়েছেন।'

বিশ্বজিৎবাবু বললেন, 'বটে! আর আমার মর্যাদা?'

স্মরজিৎ বললেন—'আপনার মর্যাদা তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। ভুবন কাকা ছেলেবেলা থেকে আপনার সেবা করেছেন, শ্রীলেখাও আপনার স্নেহের পাত্রী।'

বিশ্বজিৎবাবু ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন—'থাক্ থাক্, উপদেশ

দেওয়ার জন্য তোমাকে আমি ডাকিনি। স্নেহের পাত্রী! স্নেহের প্রতিদান তো সে খুবই দিলে।'

পিতাপুত্রের বিতণ্ডার মধ্যে মা এসে পড়লেন। স্মরজিতের ব্যাপারটি তার খুব মনঃপুত না হলেও ছেলের পক্ষই নিলেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত রাজীও করালেন বিশ্বজিৎবাবুকে। বললেন, বাইরের সম্মানের চেয়ে তাঁদের কাছে ছেলের জীবন, তাঁর সুখ শান্তি অনেক বড়।

বধূ হয়ে ঘরে এলেন শ্রীলেখা। আবাল্যের পরিচিত ঘর। কতবার এসেছেন, গেছেন। এবাড়ির প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি আসবাব, প্রতিটি কোণ কানাচে শ্রীলেখার জানা। কিন্তু রাঙা চেলী পরে সিঁদুরে চন্দনে নতুন বেশে যখন এ-বাড়িতে এসে তিনি ঢুকলেন, তাঁর চোখে এ বাড়ির রূপ যেন বদলে গেল। রাঙা চেলীর রঙ লাগল সর্বত্র। তবু দুদিন যেতে না যেতেই তাঁর মোহ ভাঙল, রঙ গেল মুছে। পরিবারের প্রতিটি মানুষের হাব ভাব দেখে তাঁর ধারণা হোল যেন তিনি এ-বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেছেন, হীন ছলনা আর কূট কৌশলের সাহায্যে যেন এ-বাড়িতে ঢুকেছেন তিনি। সে গোপন রহস্য কারো কাছেই যেন আর অবিদিত নেই। সবচেয়ে বিস্মিত আর ব্যথিত হলেন তিনি শ্বশুরের ব্যবহারে। সেই স্নেহপ্রবণ বিশ্বজিৎবাবুর, যিনি তাঁকে মা ছাড়া ডাকতেন না, আপন মেয়ের মত ভালবাসতেন, তিনি একেবারে আমূল বদলে গেছেন। কঠিন পাষাণ, পাথর হয়ে গেছেন তিনি। শ্রীলেখার সঙ্গে কোন কথাবার্তা তিনি বড় একটা বলেন না, কোন সম্ভাষণ করেন না, শ্রীলেখার দেওয়া কোন খাবার ছুঁয়েও দেখেন না তিনি। তাঁর অন্তরের স্নেহের উৎস যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। তাঁর আচরণের কথা কি করে যেন কানে গেল

শ্রীলেখার বাবা ভুবন কম্পাউণ্ডারের। তিনি এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন বিশ্বজিৎবাবুর সামনে—'যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আমার মেয়েকে আপনি ক্ষমা করুন। ওর উপর আপনি বিরূপ হবেন না। দয়া করে যখন ওকে আপনি ঘরে নিয়েছেন, ওর উপর আর রাগ করে থাকবেন না।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন বিশ্বজিৎবাবু—'বলেন কি বেয়াই মশাই, আপনার মেয়েকে আমি দয়া করবার কে? বরং তার দয়াতেই আমরা আছি। আমরাই আশ্রিত।'

ভুবন ভট্‌চায বললেন—'আমি আপনার সেবক, সাধারণ একজন কম্পাউণ্ডার, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবেন না ডাক্তারবাবু।'

বিনয়ে অনুনয়ে মন গলল না বিশ্বজিৎবাবুর; বরং তাঁর মনে হল ভুবন কম্পাউণ্ডারই বিনয়ের আড়ালে তাঁর সঙ্গে পরিহাস করছে, মজা দেখছে মনে মনে।

কারণ শেষ পর্যন্ত কম্পাউণ্ডারের জেদই তো বজায় রইল। তার ইচ্ছাই তো জয়ী হোল জামাইয়ের ইচ্ছার ওপর। বিশ্বজিৎবাবু তেমনি কঠিন বিদ্রূপে বললেন, 'তাইতো, বড় মুশকিলের কথা হল যে ভুবন। তুমি আমার বেয়াই। অথচ প্রাণ খুলে ঠাট্টা পরিহাসটা পর্যন্ত করতে পারছ না। তার চেয়ে এক কাজ করো। কাল থেকে এখানকার কম্পাউণ্ডারীটা ছেড়ে দাও। দুই বেয়াইতে মন খুলে আমোদ স্ফূর্তি করা যাবে। আমার বেয়াইগিরি আর কম্পাউণ্ডারগিরি তো একসঙ্গে চলে না।' তারপর ক্যাশিআরকে ডেকে বিশ্বজিৎবাবু বলে দিলেন—'পাওনা মাইনের চেয়ে এ পর্যন্ত শ' পাঁচেক টাকা বেশিই নেওয়া আছে কম্পাউণ্ডারবাবুর। তবু একমাসের মাইনে ওঁকে দিয়ে দিন। কাল থেকে উনি আর আসবেন না।'

ভুবন কম্পাউণ্ডার মিনিটখানেক বিশ্বজিৎবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে

নির্বাক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন—'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ?'

বিশ্বজিৎবাবু বললেন—'না ভুবন, আমি সত্যি কথাই বলছি। এখন পর্যন্ত তুমি আমার কম্পাউণ্ডার। আমি ডাক্তার। কাল চাকরিটা ছেড়ে দিলে ঠাট্টার সম্পর্ক আমাদের মধ্যে অবাধ হবে।'

অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তারপর আর একটা ওষুধের দোকানে কাজ পেয়েছিলেন ভুবন কম্পাউণ্ডার। কিন্তু সে কাজ বেশিদিন মন দিয়ে করতে পারেননি তিনি, গোড়াতেই মাথায় একটা ছিট ছিল ভুবনের। এ সব ব্যাপারের পর রীতিমত অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ দেখা গেল তাঁর মধ্যে। প্রায়ই দেখা যেতে বিশ্বজিৎবাবুর ডিসপেন্সারীর পথটিতে তিনি ঘন ঘন পায়চারি করছেন আর কি যেন বকছেন বিড়বিড় করে। অবশ্য সেই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বেশিদিন তাঁকে কাটাতে হয়নি, মাস চারেক পরে তিনি সংসারের সব মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। মরবার আগে শ্রীলেখার হাত ধরে বলে গেলেন— 'আমি আমার কথা রেখেছি, এবার ফেল করলেও পরের বার স্মরজিৎ নিশ্চয়ই ডাক্তারি পাস করে বেরুবে। কিন্তু কেবল পাস করলেই বড় ডাক্তার হয় না, ওকে বড় করে তোলবার ভার তোর ওপর। স্মরজিৎ যদি বড় ডাক্তার হয়ে ওঠে, তোরা যদি সুখী হোস, তাহলেই আমার মুখ থাকবে। আমার সব দুঃখ সব লাঞ্ছনা সার্থক হবে; বিশ্বজিৎ ডাক্তার তাহলে সত্যিই হেরে যাবে আমার কাছে।'

প্রথমবার পাস করতে পারেননি স্মরজিৎবাবু, দ্বিতীয়বারও সার্জারিতে ফেল করলেন। বিশ্বজিৎবাবু নির্বিকার ঔদাসিন্যে শুধু মন্তব্য করলেন—'এমন যে হবে তা আমি আগেই জানতুম, ভুবন কম্পাউণ্ডারের মেয়ে যখন ঘরে এসেছে তখন যতই পড়ুক আর

পরীক্ষা দিক, ডাক্তার হওয়া ওর আর সাধ্যে কুলোবে না। কম্পাউণ্ডারী করেই কাটাতে হবে আজীবন।'

শ্রীলেখা কান পেতে শুনলেন শ্বশুরের কথা, তারপর স্বামীর কাছে এসে বললেন—'ওসব তুলি আর রঙের বাক্স এক্ষুনি তুলে রাখ, পাস তোমাকে করতেই হবে, নইলে আমি আর কাউকে মুখ দেখাতে পারব না।'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'দরকার নেই আর কাউকে দেখবার, তোমার মুখ শুধু আমাকে দেখালেই চলবে, তারপর তুলিতে এঁকে সে মুখ জগৎসুদ্ধ লোককে আমি দেখাব। শোন, মেডিসিন আমি ছেড়ে দেব ভাবছি। ও আমার ধাতে সয় না।' কিন্তু শ্রীলেখা কিছুতেই ছাড়লেন না, বললেন, 'অন্তত আমার জন্যে আমার মুখ চেয়ে ডাক্তারি তোমাকে পাস করতেই হবে।'

জোর করে স্বামীকে ফের কলকাতায় পাঠালেন শ্রীলেখা এবং চিঠিপত্র লেখে বার বার তাঁকে চিকিৎসাবিদ্যায় উৎসাহিত করতে লাগলেন। এবার ফল ফলল, বেশ ভালো ভাবেই পাস করে বেরুলেন স্মরজিৎবাবু।

শ্রীলেখা বললেন,—'কেবল পাস করলে হবে না। তোমার বাবার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে, ওঁর চেয়ে বেশি খ্যাতি, বেশি অর্থ পেতে হবে তোমাকে, তবে আমাদের মান থাকবে, তবে ওঁর অহঙ্কার আমরা ভাঙতে পারব।'

স্মরজিৎবাবু হেসে বললেন—'দেখ, ঠিক ওইভাবে কি আমরা ওঁকে দুঃখ দিতে পারব? 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ', আমার কাছে হার মেনে বাবা ভিতরে ভিতরে খুশিই হবেন। তার চেয়ে ছবি এঁকে যদি আমি গোল্লায় যাই, তাহলে বরং ওঁর মর্মবেদনার অন্ত থাকবে না।'

কিন্তু স্মরজিতের পরিহাসে কিছুতেই কান দিলেন না শ্রীলেখা।

উঠতে বসতে বার বার বড় হওয়ার মন্ত্র দিতে লাগলেন কানে। যতদিন বেঁচে ছিলেন বিশ্বজিৎবাবু, ক্ষমা করেননি ছেলেকে, ক্ষমা করেননি পুত্রবধূকে। পুত্র পুত্রবধূর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে ভিন্ন বাড়িতে স্বতন্ত্রভাবে বাস করেছেন। শ্বশুরের স্নেহলাভের জন্য বহুবার বহু রকমে চেষ্টা করেছেন শ্রীলেখা। কিন্তু তাঁর মত ব্যক্তিত্ব-শালিনী বুদ্ধিমতী মেয়েও এক্ষেত্রে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত শ্বশুরকে বাদ দিয়ে, তার বিরোধিতা বিমুখতা মেনে নিয়েই সংসার গড়ে তুলতে হয়েছে শ্রীলেখাকে! স্বামীর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দিকে মন দিতে হয়েছে।

কথা শেষ করে স্মরজিৎবাবু একটু হাসলেন।

বিদায় নেওয়ার সময় মিসেস মুখার্জীও এলেন। দুজনেই আমাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। মিসেস মুখার্জী অন্যদিনের মত আজও স্মিতসৌজন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন—'আসবেন আর একদিন।'

পাঁচ

যতদিন ছিলাম, যতবার গিয়েছি এই নিমন্ত্রণের কোন অভাব হয়নি। যদিও সব সময় যে ওদের মেজাজ ভালো দেখছি তা নয়। কোন কোন দিন গিয়ে মনে হয়েছে একটু আগে যেন প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে। কিন্তু আমাকে দেখে দুজনেই সামলে নিয়েছেন। এই লুকোবার কাজটা মিসেস মুখার্জী যেমন সুকৌশলে পারতেন, ডাক্তারবাবু তেমন দ্রুত আর নিপুণভাবে পারতেন না। তিনি প্রায়ই মেজাজ হারিয়ে ফেলতেন।

কিন্তু এর মধ্যে যে কোন অস্বাভাবিকতা আছে তা আমার মনে হত

না। যেখানে দম্পতি সেখানেই দাম্পত্য-কলহ। দিনে কলহ, রাত্রে 'লহ লহ'। এই তো রীতি।

বছরখানেক আমি এই শহরে ছিলাম। তার মধ্যে আমাদের ব্রাঞ্চ অফিসের যে সব অদল-বদল হল তা আগেই বলেছি। কিন্তু এ-ধরনের বদলি আর উপদলীয় রেষারেষি তো অফিসের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এগুলিকে ঘটনা বলা যায় না।

কমলাক্ষবাবু মাঝখানে ছুটি নিয়ে দিন পনরোর জন্যে কলকাতা থেকে ঘুরে এলেন। এই উপলক্ষে মিসেস মুখার্জী আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনাদের ম্যানেজার কি বিয়ে করতে গেলেন নাকি?'

বলেছিলাম—'না না, তেমন তো কিছু শুনিনি।'

তিনি বলেছিলেন—'সবাই কি আর ও ব্যাপার পাড়াপড়শীকে দেখিয়ে শুনিয়ে করে?'

বলেছিলাম—'ওঁর বাবার অসুখের কথাই শুনেছি। বিয়ে-টিয়ে ধরনের কিছু হলে নিশ্চয়ই আমাদের বলতেন।'

তিনি বলেছিলেন—'তাইতো, না বলবার কি আছে।'

যাওয়ার আগে গঙ্গাবাঈয়ের ছেলের আর একটি দুষ্কর্মের কথা আমি জেনে গেলাম। নিবারণ সরকার নামে একজন প্রবাসী বাঙালীর কাপড়ের দোকান ছিল। গঙ্গাবাঈয়ের অনুরোধে সেই ফ্যান্সি স্টোর্সে কমলাক্ষবাবু বেণীকে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। বেচাকেনাও করত আবার মালপত্র আনা-নেওয়ার কাজও করত। সে হাজার দেড়েক টাকার একটি বেয়ারার চেক আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে সেই টাকা চুরি করে নিয়ে পালাল। চেকটা দোকানের মালিক তার হাতে দেননি। অন্য একজন কর্মচারীকে ভুলিয়ে টুলিয়ে বেণী চেকটা হস্তগত করে।

গঙ্গাবাঈ এসে কমলাক্ষবাবুর কাছে কেঁদে পড়ল—'আমি আর মুখ দেখাতে পারব না ম্যানেজার সাব। আমাকে ও শেষ করে দিয়ে গেল।'

আমরা সবাই তাকে প্রবোধ দিলাম। এ ব্যাপারে তার তো কোন দোষ নেই। তার লজ্জা কিসের।

গঙ্গাবাঈ বলল—'সব আমার নসিব।'

এর আগে নাকি বেণী তার মায়ের টাকা আদায় করতে আসত। দু'একবার টাকা তাকে দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু গঙ্গাবাঈ নিষেধ করে দিয়েছে তার মাইনের টাকা যেন বেণীকে কেউ না দেয়। তার মেহনতের টাকায় দারু খায় বেণী, সংসারে এক পয়সাও দেয় না।

এই নিয়ে পুলিসের হাঙ্গামা, আর খানাতল্লাসীও গঙ্গাবাঈয়ের বাড়িতে হয়ে গেল। পুলিস বেণীর তরুণী স্ত্রী তারাবাঈকেও নাকি খুব জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে শুনলাম।

দিনকয়েক পরে গঙ্গাবাঈ আর আসে না। জ্বালানি কাঠ আনতে গিয়েছিল পাহাড়ে। নামবার সময় দারুণ চোট খেয়ে পড়ে গেছে। খুব জ্বর। উঠে বসবার শক্তি নেই।

আমাদের রান্নাঘরে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আবার বিশৃঙ্খলা শুরু হল।

গঙ্গাবাঈয়ের অসুখের খবর পেয়ে আমি তাকে একদিন দেখতে গেলাম। তখন আমার বদলির অর্ডার এসে গেছে।

ভাবলাম যাওয়ার আগে দেখা করে যাই।

সরু গলির মধ্যে সারি সারি ঘিঞ্জি মাটির ঘর। ক্ষীণ দীপের আলোয় তার অন্ধকার দূর হয়নি।

ময়লা বিছানায় গঙ্গাবাঈ জ্বর নিয়ে পড়েছিল। আমাকে দেখে উঠে বসতে চেষ্টা করল। আমি বললাম, 'তোমায় উঠতে হবে না। তুমি শুয়ে শুয়েই কথা বল।'

গঙ্গাবাঈ তারাবাঈকে একটা আসন এনে দিতে বলল। একগলা ঘোমটা টেনে তারাবাঈ ছোট্ট একটি দড়ির খাটিয়া আমার দিকে এগিয়ে দিল। মাটির পিলসুজের ওপরে মাটির দীপ জ্বলছে। তারাবাঈ সলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

গঙ্গাবাঈ বার বার বলতে লাগল আমি যে তাকে দেখতে আসব তা নাকি সে ধারণাই করতে পারেনি। এমন নাকি কেউ যায় নি।

আমি বললাম—'তুমি অনেক যত্ন করেছ গঙ্গাবাঈ। তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমি বদলি হয়ে দেশে যাচ্ছি।'

গঙ্গাবাঈ বলল—'সে তো আচ্ছি বাত বাবুজি।'

তারপর সে বলতে লাগল ঘরের সুখ কি আর কোথাও মেলে। মা বহিন জরু যেভাবে আদর যত্ন করতে পারে তা কি আর কারো করবার সাধ্য আছে? তারপর নিজের ছেলের কথা তুলল গঙ্গাবাঈ। এত আদর যত্ন করেও সেই বেইমান বদমাশকে তারা বাঁধতে পারল না। সে আর তার বউ মিলে কি কম চেষ্টা করেছে? কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। খারাপ লোকের সঙ্গে মিশে তার বেটা খারাপই হয়ে গেল। কিন্তু এমন খারাপ ছেলের জন্যেও গঙ্গাবাঈয়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সে আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল বেণীর জেল টেল হয়ে যাবে না তো? পুলিসের তাড়া খেয়ে বেঘোরে প্রাণ দেবে না তো সে? লজ্জায় দুঃখে আত্মঘাতী হবে না তো?

মনে মনে ভাবলাম, শুধু প্রেমই অন্ধ তা নয়, স্নেহকে চক্ষুষ্মান্ বলবার জো নেই।

বিদায় নেওয়ার সময় গঙ্গাবাঈয়ের হাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে এলাম। কয়েকবার আপত্তি করে টাকাটা শেষ পর্যন্ত নিল গঙ্গাবাঈ।

আশীর্বাদ করে বলল—'শান্তিমে রহ বাবুজী। ভগবান মঙ্গল করুন আপকা।'

কলকাতায় ফিরে এসে সপ্তাহ দুই বাদে আমি মণিময়বাবুর এক চিঠি পেলাম। বাদলরা চলে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর চিঠিতে আরো ছোট ছোট দুটি বদলির খবর পাওয়া গেল। ডাক্তারবাবুর বাড়ির রাঁধুনী রঙ্গাবতী মেসের রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে। মিসেস মুখার্জীর দয়াতেই নাকি এমন দুর্লভ রাঁধুনীকে পাওয়া গেছে। রঙ্গার হাত রান্নায় আরো পাকা। মাছ তরকারি মিষ্টান্ন পর্যন্ত রাঁধতে পারে। ব্যাঙ্কের সবাই শতমুখে মিসেস মুখার্জীর সহৃদয়তার সুখ্যাতি করছেন। এমন কি নীলকান্তবাবু পর্যন্ত। গঙ্গাবাঈয়ের অসুখ সারে নি। তার প্যারালিসিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। দুষ্টু লোকেরা বলে স্মরজিৎবাবুর ভুল চিকিৎসার দোষেই এমন হয়েছে। তাঁর তো মাথার কিছু ঠিক নেই। রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়েও তিনি রঙ আর রেখার কথা ভাবেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছেন মিসেস মুখার্জী। তিনি তারাবাঈকে নিজেদের পরিচারিকার চাকরি দিয়েছেন। রঙ্গাবতীকে যা দিতেন তার চেয়েও বেশি দিচ্ছেন মাইনে।

শেষের ঘটনাটা বছর তিনেক বাদে আমি কমলাক্ষবাবুর মুখেই শুনি। আমি তখন ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আর কমলাক্ষবাবু দুতিনটা ব্রাঞ্চ ঘুরে ফের হেড অফিসে এসেছেন। আমার একটা একাউণ্ট তখনো ওই ব্যাঙ্কে ছিল। টাকা তুলতে গিয়ে কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা।

দুটো বেজে গেছে। চা খাওয়ার জন্যে তিনি বাইরে এলেন। আমাকেও নিয়ে গেলেন ধরে। ম্যাঙ্গো লেনের একটা রেস্টুরেণ্টের

কেবিনে গিয়ে আমরা বসলাম। পর্দাটা নিজেই টেনে দিলেন কমলাক্ষবাবু।

আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তবে জোর নয়, টিপটিপ করে।

চা টোস্ট এল।

কুশল বিনিময়ের পর আমিই জিজ্ঞাসা করলাম—'ওঁদের খবর কি ?'

তিনি বললেন—'কাদের ?'

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম—'স্মরজিৎবাবু আর মিসেস মুখার্জীর ?'

তিনি চায়ের কাপে আর এক চামচ চিনি নিতে গিয়ে আর নিলেন না, আমার দিকে চেয়ে বললেন—'আপনি শোনেননি তাঁদের খবর ?'

বললাম—'না।'

'আপনি কিছুই জানেন না ?'

বললাম—'না। আমি এসে ওঁদের দুএকখানা চিঠি লিখেছিলাম। ওঁরা বেশ দেরি করে করে সংক্ষেপে জবাব দিতেন। তারপর আস্তে আস্তে সব বন্ধ হয়ে গেল। যতটা মনে পড়ে মিসেস মুখার্জীই আমার শেষ চিঠির জবাব দেননি।'

কমলাক্ষবাবু চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে কাপটা সরিয়ে রেখে বললেন—'তিনি আর জবাব দেবেন না। তিনি আর নেই।'

আমি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম—'সে কি! কী অসুখ হয়েছিল তাঁর ? কবে মারা গেলেন ?

কমলাক্ষবাবু বললেন—'কিছুই যখন শোনেননি, তখন গোড়া থেকেই শুনুন। না হলে কিছু বুঝতে পারবেন না।'

আমি বললাম—'বলুন।'

কমলাক্ষবাবু বলতে লাগলেন—'আপনি বোধহয় আমার আর মিসেস মুখার্জীর নাম নিয়ে ক্লার্কদের মধ্যে ঠাট্টা তামাশা শুনে এসে থাকবেন। জব্বলপুরে ওই একটি পরিবারের সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম বলে ঠাট্টাটা বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার মূলে সত্যিই কিছু ছিল না। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া সত্যিই আর কিছু গড়ে ওঠেনি। মিসেস মুখার্জী তাঁর অনেক সুখদুঃখের কথা আমাকে বলতেন। তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের কিছু কিছু কথাও আমি তাঁর মুখে শুনেছি। সে ঘনিষ্ঠতা তাঁর সঙ্গে আমার হয়েছিল। কী করে হয়েছিল তা বলা কঠিন। আমাদের দুজনের সামাজিক স্তর এক নয়, জীবনের অভিজ্ঞতা এক নয়। বয়সটা প্রায় এক হলেও ত্রিশবত্রিশ বছরের একজন পুরুষ আর ওই বয়সী একটি বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে অনেক তফাৎ। তবু আমাদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে বন্ধুত্ব যে ওঁদের মধ্যে কোন অন্তরায় হবে তা আমি আশঙ্কা করিনি। কারণ ওঁরাও ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। একজনের জন্যে আর একজন যথেস্ট ত্যাগ করেছিলেন।'

আমি বললাম—'তা জানি।'

'কার কাছে শুনেছেন ?'

বললাম—'স্মরজিৎবাবুর কাছে।'

'তাহলে তো গোড়ার ব্যাপার সবই জানেন।'

কমলাক্ষবাবু বলতে লাগলেন—'স্বামীর সম্বন্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড়ই বেশী ছিল শ্রীলেখা দেবীর। স্বামীর কল্যাণ কামনার ভিতর দিয়েই তিনি তাকে ভালোবাসতেন। কেরিআর ভালো করার জন্যে উপদেশ নির্দেশও দিতেন। স্মরজিৎবাবু কখনো কৌতুক বোধ করতেন। কখনো বা তাঁর ব্যবহারে বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠত।

শ্রীলেখাও প্রথম প্রথম স্বামীর ছবি আঁকার শখকে কৌতুকের

সঙ্গেই নিয়েছিলেন। খুশিও হয়েছিলেন স্বামীর অ্যালবামে নিজের রংবেরঙের প্রতিকৃতি দেখে। কিন্তু ডাক্তারির ওপর যখন স্মরজিৎবাবুর ক্রমেই ঔদাসীন্য আসতে লাগল এবং দিনের পর দিন তিনি শিল্পচর্চায় বেশি করে মেতে উঠতে লাগলেন, ক্ষতি হতে লাগল প্রধান প্রফেশনের, সুনামের, শ্রীলেখা বেশ জোরের সঙ্গেই স্বামীকে বললেন—'আমি তোমাকে এমন করে নষ্ট হতে দিতে পারিনে। আমার বাবার শেষ ইচ্ছা আমাকে পূর্ণ করতেই হবে।'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'তোমার উৎসাহ আমার মঙ্গলের জন্য তাহলে ততখানি নয়। তোমার বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণই তোমার সবচেয়ে বড় কাজ।'

শ্রীলেখা বললেন—'দুইয়ের মধ্যে আমি তো কোন পার্থক্য দেখিনে। কিন্তু তোমার যেন ধারণা, আমি যা বলব আমি যা চাইব তার উল্টোটাই তুমি করবে। যেন আমাকে অপদস্থ অপমানিত না করে তুমি আনন্দ পাও না। আসলে তুমি কি ভাব তা আমি জানি।'

স্মরজিৎবাবু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'কি ভাবি বলতো!'

শ্রীলেখা বলেছিলেন—'তোমার ধারণা কম্পাউণ্ডারের মেয়ের পক্ষে কোন রকমে একটি পাস করা ডাক্তার জুটেছে তাই যথেষ্ট। সে ডাক্তারের খ্যাতি-প্রতিপত্তি না থাকলেও চলে।'

স্মরজিৎবাবু মুহূর্তকাল স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে একটু হেসে বলেছিলেন—'ঠিক বলেছ শ্রীলেখা। আমার মনের কথা এর চেয়ে ভালো করে গুছিয়ে আমিও বোধহয় বলতে পারতাম না।'

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমনি বাদ প্রতিবাদ কথা কাটাকাটি চলেছিল দিনের পর দিন। ডাক্তারি সম্বন্ধে স্মরজিৎবাবু যে উদাসীন তা নন,

ডাক্তারি তাঁর জীবিকা। সে সম্বন্ধে তিনি একেবারে নিস্পৃহ থাকলে চলবে কেন; কিন্তু শ্রীলেখার অভিযোগ, ডাক্তারি কেবল তাঁর জীবিকাই বা হবে কেন, তা হোক তাঁর আনন্দের বস্তু। মানুষের কল্যাণের কাজে তা লাগুক। সেই সঙ্গে তাঁর স্বামীর অর্থ বাড়ুক। তবে তো সার্থক হবেন স্মরজিৎবাবু, তবে তো আশা পূর্ণ হবে শ্রীলেখার।

বিষয়টা নিতান্তই বাইরের। ডাক্তারিতে একটু কম মনোযোগী বলে যে সংসারে অভাব অনটন আছে স্মরজিৎবাবুর, তা নয়। পৈতৃক বাড়ি ঘর অর্থ এবং বিষয়-সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হয়েছেন। মৃত্যুর আগে কি রকম একটা দুর্বলতা এসেছিল বিশ্বজিৎবাবুর মনে। শেষ মুহূর্তে ছেলেকে তিনি কাছে ডেকে ক্ষমা করে গেলেন এবং বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত করে যাননি।

কিন্তু স্মরজিৎবাবু পৈতৃক বিত্ত এমন অসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন বলে শ্রীলেখা যেন তেমন প্রসন্ন হতে পারেননি, তাঁর ধারণা এতে নিজেদের মর্যাদা হানি হয়েছে। স্মরজিৎবাবু তাঁর বাপের খ্যাতিকে ছাড়িয়ে যাবেন এই যে শ্রীলেখার পণ, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এইসব বাইরের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে স্মরজিৎবাবুর মতান্তর কথান্তর চলতে লাগল। তাঁরা যে একজন আর একজনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সে কথা যেন তাঁরা ভুলে গেলেন। প্রথম বছরের সেই অনুরাগ রঙিন দিনগুলি স্মৃতিপটে যেন ক্রমেই ফিকে হয়ে আসতে লাগল। এই সময়ে ওদের সঙ্গে কমলাক্ষবাবুর আলাপ হয়।

আলাপ হয়েছিল সাধারণ ভাবেই। স্মরজিৎবাবু স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর নামে একটা একাউন্ট খুলতে এসেছিলেন। সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে তাঁকে ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কমলাক্ষবাবুর চেম্বারে বসেই শ্রীলেখা দেবী স্পেশিমেন কার্ড লিখে দিয়েছিলেন।

তাঁর সহজ অকুণ্ঠ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন কমলাক্ষবাবু। এর আগে এমন অসঙ্কোচ ব্যবহার কলকাতার বাইরের বাঙালী মহিলার কাছে পাননি। এমন সরস সপ্রতিভ কথাবার্তা শোনেন নি। স্পেশিমেন কার্ডে নিজের স্বাক্ষরের নমুনা লিখে শ্রীলেখা দেবী স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ঠিক অবিকল এই রকম সিগনেচার না হলে বুঝি টাকা দেবেন না আপনারা?'

কমলাক্ষবাবু বলেছিলেন—'না।'

'একটু এদিক ওদিক হলেই চেক ডিসঅনার করবেন?'

'তাইতো নিয়ম।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন—'কিন্তু আমার বেলায় একটু ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সইয়ের গরমিল হলেও চেক ফিরিয়ে দেবেন না।'

স্মরজিৎবাবু বলেছিলেন—'কি রকম ঢালাও ইন্‌স্ট্রাক্‌সন্ দিয়ে রাখলেন দেখেছেন?'

কমলাক্ষবাবু বলেছিলেন—'এতে কিন্তু অসুবিধা আছে।'

শ্রীলেখা দেবী বলেছিলেন—'অসুবিধা আবার কিসের?'

কমলাক্ষবাবু বলেছিলেন—'সইয়ের গরমিল দেখেও যদি আপনার চেক আমরা পাশ করে দিই, আর তা যদি কেউ টের পায়, আপনার সই একদিন জাল হয়ে যেতে পারে।'

শ্রীলেখা দেবী হেসে বলেছিলেন—'যেন কত লাখ টাকাই রাখছি ব্যাঙ্কে। তাছাড়া আমার সইয়ের গরমিলের কথা আর তো কেউ জানতে পারবে না। জানবার মধ্যে জানলেন শুধু ডক্টর মুখার্জী আর আপনি নিজে। জাল যদি হয়, আপনাদেরই ধরব।'

শ্রীলেখার কথার ভঙ্গিতে স্মরজিৎ আর কমলাক্ষ দুজনেই হেসে উঠেছিলেন। হাজার পাঁচেক টাকার একটা একাউণ্ট খোলার মধ্যে যে এত রস আছে, আনন্দ আছে, এতকাল ব্যাঙ্কের কাজ করেও

কমলাক্ষবাবু তা কোনদিন অনুভব করেননি। কি পুরুষ, কি মেয়ে এমন অনেকে আছেন বছরের পর বছর আলাপ করলেও যাঁদের সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গতা হয় না। তাঁরা শামুকের মত একটা শক্ত আবরণের মধ্যে নিজেদের ধরে রাখতে ভালোবাসেন। সহজে ধরা দেন না, মন খোলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, এর বিপরীত প্রকৃতির স্ত্রী পুরুষেরও সাক্ষাৎ মেলে। তাঁদের প্রথম দিনের আলাপ ব্যবহার দেখলে মনে হয় যেন অনেক আগে থেকেই এই আলাপের ভূমিকা রচিত হয়েছিল। তখন যেন জন্মান্তরের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বাস করতে ভালো লাগে।

শ্রীলেখা দেবীর একদিনের সাক্ষাতে, একদিনের আলাপে এমন অন্তরঙ্গ সুর বেজে উঠল যে কমলাক্ষবাবুর মনে হল কখনো তিনি সেই সুর শোনেননি। এমন অভূতপূর্ব ঘটনা দেখেন নি। শ্রীলেখার গলার স্বর মিষ্টি, কথা বলবার ভঙ্গি মধুর। হাসলে এই রূপবতী নারীকে অতি রূপবতী মনে হয়। তাঁর রূপ সামান্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

কমলাক্ষবাবুকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্যে সেইদিনই আমন্ত্রণ করে গেলেন শ্রীলেখা দেবী। নির্দিষ্ট দিনে ফোন করে ফের খোঁজ নিয়ে বললেন—'ভুলে যাননি তো? সন্ধ্যার পর অবশ্য আসবেন। আমরা অপেক্ষা করব।'

তারপর থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কমলাক্ষবাবু যেতেন। বিনা আমন্ত্রণেই যেতেন। স্মরজিৎবাবুর আঁকা ছবি দেখতেন, ছবি আঁকার গল্প শুনতেন। কোনদিন ওঁদের অন্য দুএকজন বন্ধু থাকতেন, কোনদিন বা কেউ থাকতেন না। বাইরে থেকে স্মরজিৎবাবুর কল আসত। তিনি একটু বিরক্ত হয়ে উঠে যেতেন, কিন্তু শ্রীলেখা কমলাক্ষকে যেতে দিতেন না। বলতেন—'আপনি বসুন, আপনি উঠছেন কেন? আপনার তো আর রোগী দেখা নেই। আপনার অত তাড়া কিসের?'

কমলাক্ষবাবু যাই যাই করতেন, কিন্তু যেতে পারতেন না, গল্পে গল্পে যাওয়ার কথা ভুলে যেতেন। শ্রীলেখা দেবীর অনুরোধে কোনদিন খেয়েও যেতে হত।

তারপর থেকে এমন হয়ে গেল যে একদিন দেখা না হলেই কেমন যেন খালি খালি লাগে। পরদিন কাজকর্মে মন লাগে না, উৎসাহ আসে না। কিন্তু তাই বলে রোজ তো আর যাওয়া যায় না। কোন অজুহাতেই সাপ্তাহিক সাক্ষাৎকে দুদিনের বেশি বাড়ানো চলে না। সপ্তাহে দুদিন দেখা আর দুদিন শোনা। মানে ফোনে কথাবার্তা। শ্রীলেখা নিজেও ফোন করে খোঁজ নিতেন।

একদিন বললেন—'আপনি নাকি পার্ক পর্যন্ত এসে ফিরে গেছেন ?'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'না না।'

শ্রীলেখা বললেন—'না না মানে ? রঞ্জা দোকান থেকে ফেরার পথে আপনাকে দেখতে পেয়েছিল। পাছে দুদিনের বেশি তিন দিন হয়ে যায় ! তাই না ? আচ্ছা, এতদিনেও আপনার সঙ্কোচ গেল না ? দাঁড়ান, রঞ্জাকে এখন থেকে রোজ পার্কের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখব যাতে আপনি আর পালাতে না পারেন।'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'রোজ কিন্তু আমি ওদিকে যাই না।'

'এলে ক্ষতিটা কি ?'

'ক্ষতি নেই তো ?'

'মোটেই না। আপনি রোজ আসবেন।'

কমলাক্ষবাবু অবশ্য রোজ যেতেন না। তবে যেদিন যেতেন, অনেকক্ষণ কাটিয়ে আসতেন। শ্রীলেখা দেবী তাঁকে সহজে উঠতে দিতেন না। এই আদর-আপ্যায়ন কমলাক্ষবাবু শুধু একাই ভোগ করতেন তা নয়, ব্যাঙ্ক থেকে যে-ই যেত তাকেই যত্ন করতেন। বাদলও

প্রায়ই যেত। খেয়ে আসত, ফুল নিয়ে আসত। বছরে দুএকবার ব্যাঙ্কের সবাইকেই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন শ্রীলেখা দেবী। আপত্তি করলে বলতেন—'আপনারা বিদেশে এসেছেন। এটুকু আদর যত্নও যদি না করি, এই পাথুরে দেশে আপনাদের মন টি ঁকবে কেন ?'

শ্রীলেখা দেবী স্কুলে কয়েক বছর পড়লেও কলেজে নিশ্চয়ই পড়েননি, তবু যে তাঁর কথাবার্তায় আদরে ব্যবহারে উচ্চ শিক্ষা আর সংস্কৃতির ছাপ থাকত, তাঁর কৃতিত্ব স্মরজিৎবাবুর। তাঁর এই যথোচিত প্রাপ্য কমলাক্ষবাবুও দিয়েছেন। স্মরজিৎবাবু শুধু স্ত্রীকে তাঁর ছবির মডেল হিসাবেই ব্যবহার করেননি, তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সমাজের উচ্চ-শিক্ষিত অভিজাত মহলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, সেই সমাজে চলবার মত উপযুক্ত করে তুলেছেন। স্বাধীন-ভাবে চলাফেরার শুধু অনুমতিই দেননি, শক্তি আর সাহস অর্জনেও শিক্ষা দিয়েছেন। দরিদ্র অর্ধশিক্ষিত কম্পাউণ্ডারের মেয়েকে নিজের যোগ্য সহধর্মিণী করে নিয়েছেন স্মরজিৎবাবু।

তবু তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরল। চিড় ধরল স্মরজিৎবাবুর ছবি আঁকা নিয়ে। শিল্পের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গিয়ে স্মরজিৎবাবু যখন ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি হারাতে লাগলেন, পসার নষ্ট হতে লাগল, শহরে অখ্যাতি রটল রোগীর চিকিৎসায় তিনি যথেষ্ট মনযোগ দেন না, অনেক সময় ভুল চিকিৎসা করে রোগীকে কষ্ট দেন, শ্রীলেখা দেবীর আর সহ্য হল না, তিনি স্বামীকে উঠতে বসতে তিরস্কার করতে লাগলেন। কান্তার গঞ্জনা যখন গুঞ্জনের মত তখন স্বামীর কাছে তা সুখশ্রাব্য হলেও, সেই গুঞ্জন যখন স্ফুটতর হতে হতে গর্জনের সীমায় গিয়ে পৌঁছে, তখন আর তা সহনীয় থাকে না। স্ত্রীর উপদেশ নির্দেশ ক্রমে স্মরজিৎবাবুরও সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেল।

তারপর একদিন কমলাক্ষবাবুর সামনেই দারুন ঝগড়া হল দুজনের।

শ্রীলেখা বললেন—'তুমি যদি ও সব ছবি-টবি আঁকা না ছাড় আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

স্মরজিৎবাবু কৌতুকের স্বরে বললেন—'তাহলে তো বড় মুশকিলে পড়তে হবে। নতুন মডেল খুঁজতে বেরোতে হবে আমাকে?'

শ্রীলেখা চটে উঠে বললেন—'মডেল? আমি কি শুধু তোমার মডেল? তাই ভেবেছ বুঝি আমাকে?'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'আহা, অত রাগ করছ কেন। মডেলের একটা মানে হল আদর্শ। যেমন মডেল কপি বুক।'

শ্রীলেখা সেই রসিকতায় কান দিলেন না। বললেন—'আমি জানি তুমি আমাকে তাই ভাব। স্ত্রীকে যারা একটা মডেলের চেয়ে বেশি মূল্য দেয় না, নিজের খেয়ালের আর খেলার বস্তুর চেয়ে বেশি করে দেখে না, তেমন স্বামীকে আমিও পুরো মানুষ বলে মনে করিনে।'

কমলাক্ষবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মিসেস মুখার্জী, কী বলছেন আপনি, থামুন। আমি বরং এবার যাই।'

শ্রীলেখা বললেন—'না না, আপনি বসুন। আপনার সামনেই যখন কথাটা উঠল, আপনি শুনে যান সবটা। আপনি তো আমাদের অনেক কথা জানেন, অনেক কথাই শুনেছেন, আপনার অত সঙ্কোচ কিসের? আপনি নিশ্চয়ই জানেন শহরে ওঁর বদনাম বেড়ে যাচ্ছে। সেবার গঙ্গাবাঈকে নিয়ে অমন একটা কাণ্ড হল। বেচারাকে চিরজন্মের মত শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হবে। তারপর হাসপাতালেও উনি এমন এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন যে মুখ দেখানো ভার। এমার্জেন্সী ওআর্ডে যে পেশেণ্টটি মারা গেছেন তা নাকি ওঁরই দোষে। এই নিয়ে এনকোয়ারী হচ্ছে। দোষ যদি প্রমাণ হয়—হবেই, ওঁর জেল হয়ে যাবে। অতখানি না হলেও হাসপাতালের চাকরি যে আর থাকবে না, মান সম্মান যে সবই যাবে, তা আমি জানি!'

কমলাক্ষবাবুর সামনে যে এ প্রসঙ্গ তোলা স্মরজিৎবাবু পছন্দ করেননি, তা তিনি অপমানিত স্বামীর মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারলেন।

স্মরজিৎবাবু অতি কষ্টে মেজাজ সামলে নিয়ে বললেন—'আমার দোষ কিনা তা আগে প্রমাণ হোক, তখন দেখা যাবে। কিন্তু ভুল-ত্রুটি কি অন্য ডাক্তারেরও হয় না? যে ডাক্তার ছবি আঁকে না তার চিকিৎসায় কি সব রোগী বাঁচে?'

শ্রীলেখা বললেন—'কিন্তু তাঁদের নামে এ-ধরনের অখ্যাতি হয় না, অযোগ্যতার দুর্নাম রটে না? মানুষের জীবন নিয়ে এমন খেলা করবার অধিকার তোমাকে কে দিল আমি তাই শুনতে চাই।'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'খেলার অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। যে খেলে সে নিজের জীবন নিয়েও খেলে, শুধু পরের জীবন নিয়ে খেলে না। তাই সে অধিকার তার নিজের কাছ থেকে পাওয়া, কারো দেওয়া নয়।'

শ্রীলেখা বললেন—'ওসব তত্ত্বকথা আমি শুনতে চাইনে। তোমার ওই বাতিক তুমি ছাড়বে কিনা তাই বল।'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'বেশ বাতিকই হল। কিন্তু নেশাই বল, আর বাতিকই বল, আর খেয়ালই বল, একটা না একটা অবলম্বন প্রত্যেকেরই চাই। আমার একমাত্র অবলম্বন তোমার কাছে অসহ্য লাগছে কেন?'

শ্রীলেখা বললেন—'লাগছে এই জন্যে যে, আমি তোমার ভালো চাই। তোমার যশ আর সুনাম চাই। আমি জানি ওই বাতিকটা ছেড়ে দিলে তুমি একজন পুরো ডাক্তার, একজন পুরো মানুষ হতে পারবে।'

স্মরজিৎবাবু বললেন—'পুরো মানুষ! এখন বুঝি আমি আর পুরো মানুষ নই? নির্ভেজাল ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার কি ব্যাঙ্কার ছাড়া বুঝি তুমি ঠিক পছন্দমত মানুষ মনে কর না?'

মহা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন কমলাক্ষবাবু। এতদিন স্মরজিৎবাবুর ব্যবহারে ছোটখাট হাসি পরিহাসে অল্প স্বল্প ঈর্ষার আভাস যে না পেয়েছেন তা নয়, কিন্তু নিজের বাড়িতে, নিজের ড্রয়িংরুমে বসে তিনি বাইরের একজন ভদ্রলোককে এবং সেই সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে এমন স্পষ্টভাষায় অপমান করতে পারবেন, তা অভাবিত।

কিন্তু কমলাক্ষবাবু কিছু বলবার আগেই শ্রীলেখা দেবীই জবাব দিলেন স্বামীর কথার। আরক্ত মুখে তিনি বললেন—'দেখ অভদ্রতারও একটা সীমা আছে। তুমি যে এতদূর নীচে নেমে যেতে পার, আমি তা ভাবতেও পারিনি। কমলাক্ষবাবু, আপনি আর এ বাড়িতে আসবেন না।'

এতদিন আসার নিমন্ত্রণই পেয়েছেন। আসতে নিষেধ এই প্রথম। কিন্তু নিষেধের মধ্যে কোথায় যেন সব বাধা অতিক্রম করে যাওয়ার সুর বেজে উঠল।

কমলাক্ষবাবু নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছিলেন, স্মরজিৎবাবু তাঁর হাত চেপে ধরলেন—'আপনি যাচ্ছেন কেন? আই ডিডণ্ট মিন দ্যাট, শ্রীলেখা যাই বলুক, আই ডিডণ্ট মিন্ ইউ, ব্যাঙ্কার বলতে একজন ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারকে বোঝায় না।'

এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল।

কমলাক্ষবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—'আপনি আজ প্রকৃতিস্থ নেই। আপনাকে আজ কোন কথা বলা আমার উচিত নয়। আপনি নিজের জীবন নিয়ে যত সাধ হয় খেলুন, তবে অন্যের জীবন-মান-সম্মান নিয়ে খেলা না করাই ভালো।'

তিনি তখনই বেরিয়ে চলে এলেন।

কিন্তু পরদিন স্মরজিৎবাবু ফের ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির।

তিনি কমলাক্ষবাবুর চেম্বারে ঢুকে বললেন—'আমাকে মাফ করতে হবে।'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'না না, সেকি !'

তিনি বললেন—"সত্যি আমার মেজাজ ভালো ছিল না। কি বলতে কি বলে ফেলেছি ঠিক নেই। আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়। আমি করজোড়ে বলছি আপনি সব ভুলে যান।'

কমলাক্ষবাবু বড় বিব্রত বোধ করলেন, বললেন—'আচ্ছা আচ্ছা, সব ঠিক আছে। আপনি এমন কিছু বলেন নি—।'

কিন্তু শুধু 'আচ্ছা আচ্ছা' বলেই রেহাই পেলেন না কমলাক্ষবাবু। মারবেল রকে যাওয়ার নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতে হল। তখন ব্যাঙ্কে নানা রকমের গোলমাল। নীলকান্তবাবু ঘোঁট পাকিয়ে তুলেছেন। বাদল, নিরুপম আর আমার বদলে যারা নতুন সেখানে গেছেন তাঁদের সবাই একাউন্টেন্টের দলে। চিঠি লেখালেখি চলছে হেড অফিসে। কমলাক্ষবাবু প্রায় একক হয়েও কিছুতেই হার মানছেন না। সমানে মসিযুদ্ধ চলছে।

এসব সত্ত্বেও রাজী হতে হল। শ্রীলেখা দেবী নিজেই ফোন করে বললেন—'ভেবেছি নাগপুরে আমার এক জেঠতুতো ভাইয়ের কাছে গিয়ে থাকব। তখন তো আর দেখা হবে না। চলুন একদিনের জন্যে একটু ঘুরে আসা যাক। জায়গাটা তো আমাদের তিন জনেরই পছন্দ। জায়গার গুণে মন আর মেজাজটা বেশ ভালো হয়ে যাবে।'

এমন ক্লান্ত আর করুণ শোনাচ্ছিল শ্রীলেখার গলা যে কমলাক্ষবাবু না করতে পারলেন না।

শনিবার রবিবার ভিড় বেশি হয়। ও দুদিন বাদ দিয়ে সোমবারই বেড়াতে যাওয়ার দিন ঠিক হল।

কমলাক্ষবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন, নীলকান্তবাবু একটু বাধা দিয়ে

বললেন—'আপনি স্টেটমেণ্টটা দেখে সই করেননি। পাঠাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।' কমলাক্ষবাবু বললেন—'পরে এসে করব। আর না হয়তো আপনিই সই করে পাঠিয়ে দিন।'

নীলকান্তবাবু বললেন—'তাছাড়া আজ কতকগুলি জরুরী কাজও আছে। আজ আপনার না বেরোনই বোধ হয় ভালো ছিল।'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'চার্জে যখন আমি আছি, কী কাজ আছে না আছে, তা বোধহয় আমিই সব চেয়ে ভালো জানি। আপনি আপনার কাজ করুন গিয়ে।'

একাউণ্টেণ্টের চোখের সুমুখ দিয়ে কমলাক্ষবাবু গটগট করে বেরিয়ে এলেন।

সারাদিনের প্রোগ্রাম।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই মারবেল রকেই তাঁরা কাটাবেন। ঝরনার জলে স্নান, তারপরে চড়ুইভাতি। শুক্লা চতুর্দশীর তিথি ছিল। চাঁদের আলোয় নৌকো করে বেড়ানো, সব ব্যবস্থাই ঠিক ছিল। এমন আনন্দ উৎসব তাঁরা অনেকবারই করেছেন।

সকাল প্রায় নটায় গিয়ে পৌঁছলেন কমলাক্ষবাবুরা। শ্রীলেখা তারাবাঈকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সে আগের ঘোমটা-টানা তারাবাঈ আর নেই। শ্রীলেখা তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বছর খানেকের মধ্যে একেবারে আধুনিকা তরুণী করে ছেড়েছেন। তাতে আরো তার রূপ খুলে গেছে। তার ওপর রান্নাবান্নার ভার দিয়ে শ্রীলেখারা বেড়াতে বেরোলেন! প্রপাতের কাছে গেলে তার গর্জনের শব্দে কান পাতা যায় না। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বললেও শোনা যায় না কারো গলা। উঁচু পাহাড় থেকে খরস্রোত জলধারার সেই সশব্দে পতনের দিকে শুধু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। গৈরিকে পাটকেলে মেশানো জলের সেই রং থেকে চোখ ফেরানো যায় না। একটু বাদে হঠাৎ কমলাক্ষবাবুর

খেয়াল হল স্মরজিৎবাবু তাঁদের সঙ্গে নেই। তিনি চুপি চুপি গিয়ে একটি গাছের নিচে বসে নিজের মনে স্কেচ করতে বসেছেন। তুটো প্রপাতের এই বিপুল শব্দও বোধহয় এ মুহূর্তে তাঁর কানে যাচ্ছে না।

নিজের খেয়ালী স্বামীর সেই নিবিষ্ট মূর্তির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন শ্রীলেখা। তারপর কমলাক্ষবাবুর দিকে চেয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে একটু হেসে বললেন—'জানেন আসবার সময় আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল আজ আর ছবি আঁকবে না। একটা দিন অন্তত বাদ দেবে, একটা দিন অন্তত আমাকে দেবে।'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'এমন প্রতিজ্ঞা আপনি করাতে গেলেন কেন? আপনি তো জানতেন ওকথা তিনি রাখতে পারবেন না।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন—'আমি নিজের সঙ্গে নিজে বাজি রেখে-ছিলাম। ওঁর কাছে আমার মূল্য বেশি, না, ওঁর খেয়ালের মূল্য বেশি, আমার ছায়ার দাম বেশি, না, আমার হাত-পা-নাক-চোখ—আমার দেহের গড়নের দাম বেশি—একটি দিনের জন্যে তা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাজিতে আমি হেরে গেলাম।'

কমলাক্ষবাবু বললেন, 'এর মধ্যে হার-জিতের কি আছে? তাছাড়া এতো মদ-গাঁজা-ভাঙের নেশা নয় যে, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন। সেই সব নেশাই মানুষকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছাড়াতে হয়। এতো সে ধরনের নেশা নয়।'

শ্রীলেখা দেবী বললেন—'আপনি জানেন না, ওঁর নেশা তার চেয়েও খারাপ। ওঁর কাছে আমি আর ওই তারাবাঈয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমরা তুজনেই মডেল মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। উনি বলেন উপাদানটা তুচ্ছ। তাকে উপাদেয় করতে পারাটাই সবচেয়ে বড় কথা। ধূলিমুঠিকে যদি সোনামুঠি না করতে পারলাম তাহলে করলাম

কি ? বুঝতে পারছেন এক মুঠো ধুলোর চেয়ে বেশি দাম আমার ওঁর কাছে নেই।'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'ওসব শুধু মুখের কথা। শিল্পীই হন আর অশিল্পীই হন, সবাই কোন-না-কোন সময় সাজিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন। ওসব কথাকে সত্যি বলে ধরতে নেই।'

আরো কিছুক্ষণ তাঁরা ঘুরে বেড়ালেন। যেখানেই যান, জলপ্রপাতের বজ্রগর্জন লেগেই আছে। নিজেদের কথা কিছুতেই বলবার জো নেই।

তবু ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের আলাপ চলতে লাগল।

শ্রীলেখা দেবী বললেন—'পাথরগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মরা গাছের গুঁড়ি। রূপকথায় আছে, মানুষকেও শাপ দিয়ে পাথর করে রাখা হত। আমি কিন্তু পাথর হতে চাইনি।'

কমলাক্ষবাবু বললেন—'আপনি পাথর হবেন কোন্ দুঃখে, আপনি হবেন ঝরনা।'

শ্রীলেখা দেবী হাসলেন—'ঝরনা! আপনাকে কবিত্বে পেয়ে বসল! না, শিল্প নয়, সাহিত্য নয়, ও ধরনের পরোক্ষপ্রাপ্তি ঢের হয়েছে। আমি চাই রক্তমাংসের জীবন। আমি চাই সাংঘাতিক কিছু করতে। খুব সাংঘাতিক। পারবেন ? সাহস আছে আপনার ?'

শ্রীলেখা চোখে চোখ রাখলেন কমলাক্ষবাবুর।

তার অনেকক্ষণ আগে থেকেই তার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছে।

কমলাক্ষবাবু বললেন—'কী বলছেন আপনি ?'

শ্রীলেখা বললেন—'পালাতে বলছি। চলুন পালাই। চলুন ছুটে যাই। এই পাথরের মত নিষ্প্রাণ জড় হয়ে পড়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না। মারবেল রকই হোক আর যাই হোক, পাথর পাথরই। আমি পাথর হতে চাইনে। পাথরের প্রতিমূর্তি হতে চাইনে, পটের প্রতিমূর্তি হতেও চাইনে। চলুন যাবেন ?'

কমলাক্ষবাবু তেমনি অস্ফুটস্বরে বললেন—'কী বলছেন আপনি?'

শ্রীলেখা অদ্ভুতভাবে তাঁর দিকে একপলক তাকিয়ে রইল। তারপর সশব্দে হেসে উঠে বললেন—'কিছুই বলছিনে। আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। মানুষের সব কথাকেই সত্যি বলে ধরতে নেই। মেয়েদের সব কথাকেই মিথ্যে বলে ধরতে হয়।'

তারাবাঈ রান্না শেষ করেছে। শ্রীলেখা তেলের শিশি তোয়ালে আর শাড়ি নিয়ে ঝরনার জলে স্নান করতে গেলেন।

স্মরজিৎবাবু তখনো ছবি আঁকায় মগ্ন। কমলাক্ষবাবু তাঁর ধ্যান ভঙ্গ না করে খানিকটা দূরে গিয়ে উঁচুমত একখণ্ড পাথরের টিবির ওপর বসে সিগারেট ধরালেন। আর ভাবতে লাগলেন শ্রীলেখার এই আচরণের মানেটা কি। তাঁর কোন্ কথাটা সত্য, আর কোন্‌টা মিথ্যে। তাঁর এই পরিহাসের মধ্যে কোন্ বেদনা লুকিয়ে আছে, কোন্ কামনার অপূর্ণতা!

তাঁর চমক ভাঙল তারাবাঈর চিৎকারে। সে এসে বলল—'বাবুজী বাবুজী, সর্বনাশ হয়েছে! দিদিমণি জলে ডুবে গেছেন। নর্মদা মাঈ ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁকে।'

'সে কি!'

বলে কমলাক্ষবাবু টিবির ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়লেন। ছুটে গেলেন ঝরণার কাছে। তার আগে স্মরজিৎবাবু, রঙ্গলাল পাণ্ডা, তার স্ত্রী, আরও জনদশেক বিদেশী টুরিস্টের একটি দল সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

কিন্তু তারও আগে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।

শুধু একটি গন্ধ তেলের শিশি আর গাঢ় নীল বর্ণের একখানি শাড়ি সেখানে পড়ে আছে। শ্রীলেখার কোন চিহ্নমাত্র নেই। হিংস্র তীব্র বীভৎস জলধারা তুমুল শব্দে অধঃপতিত হচ্ছে। তার লজ্জা নেই,

কলঙ্কের ভয় নেই, ভবিষ্যতের ভাবনার কোন অর্থ নেই তার কাছে। তার বজ্রগর্জনে স্মরজিৎ আর কমলাক্ষের সমস্ত বিলাপকে একই সঙ্গে ঢেকে দিয়েছে।

পুলিস ব্যাপারটাকে অ্যাকসিডেণ্ট বলেই ডায়েরি করল। শ্রীলেখাকে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছে এমন সাক্ষ্য কেউ দিল না। হতে পারে ভয়ে, সঙ্কোচে, হতে পারে অন্য কোন কারণে।

কিন্তু শহরে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

কমলাক্ষবাবু নিজেই চেষ্টা করে বদলি হয়ে এলেন। ছেড়ে দিয়ে এলেন ওখানকার ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের রাজপদ।

আসবার আগের দিন স্মরজিৎবাবুর সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে সেই একই পুরনো প্রশ্ন করেছিলেন স্মরজিৎবাবু—'সে কেন এমন করল বলুন তো? তাকে যে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম সে কেন তা বুঝতে পারল না, সংসারে একজনকে বুঝবার আর বোঝাবার এত উপায় আছে, এত কথা, এত সুর, এত রঙ রয়েছে সে জন্যে, তবু আমরা কেন বুঝতে পারিনে, তবু কেন এত ভুল বুঝি?'

কমলাক্ষবাবু এ কথার কোন জবাব দিতে পারলেন না। চেষ্টাও করলেন না।

স্মরজিৎবাবু বললেন—'জানেন, আমি তাকে যেখানে পেয়েছিলাম সেখানেই হারালাম।'

কমলাক্ষবাবু মনে মনে বললেন—'আমিও তাই। আমিও তাঁকে যখনই পেলাম তখনই হারালাম।'

রেস্টুরেণ্টে কমলাক্ষবাবুর কাছে এ কাহিনী শুনেছিলাম, সেও অনেক বছর হয়ে গেল। ভোলবার মত কথা নয়, তবুও ভুলে গিয়েছিলাম।

যা বিস্মরণীয় তাতো আমরা ভুলিই, যা অবিস্মরণীয়, সময় আমাদের তাও ভুলিয়ে দেয়।

স্মরজিৎবাবুর 'জলপ্রপাত' আমায় সব মনে করিয়ে দিল। অনুমান করা শক্ত, রঙ আর রেখার এই দুর্বোধ্য সংমিশ্রণে তাঁর বলবার আর না বলবার ইচ্ছার মধ্যে কোন্‌টা প্রবল।
